গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৮ ডিসেম্বর ২০০৭ - ৩ জানুয়ারি ২০০৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সাচার কমিটির রিপোর্ট

দেশে সমানাধিকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে

বিচারপতি রাজিন্দার সাচার কমিটির রিপোর্টে দেশের ১৩ কোটি ৮২ লক্ষ (২০০১ সালের জনগণনার হিসাব) মুসলিমের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ২০০৫ সালে গঠিত এই কমিটি ১৭ নভেম্বর ২০০৬ রিপোর্ট পেশ করেছে। সাচার কমিটি যা বলেছে তা নতুন কিছু নয়। এর আগেও নানা কমিশন একই কথা বলেছে। ১৯৭৮ সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হয়। ১৯৮০ সালে সংখ্যালঘু ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সৈয়দ মহম্মদ কমিটি গঠিত হয়। '৮৩ সালে এই কমিশন রিপোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ করা হয়নি। ১৯৯৫ সালে মুসলিম জনগোষ্ঠীর চরম দুর্দশা সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিল মাইনরিটি কমিশন। ১৯৯৬ সালে পরিকল্পনা কমিশন মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে সমস্ত রিপোর্টের ওপর বছর বছর কেবল ধুলো জমেছে, সংখ্যালঘু জনগণের দুর্দশার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। আসলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কেমন আছেন সেটা জানাই যথেষ্ট নয়, অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোটাই আসল কাজ। তাই এত কমিশন, এত রিপোর্টের পরও কেন ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, জীবিকা, সামাজিক অবস্থানের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, সেটা বিচার করা সবচেয়ে জরুরি।

একথা সকলেই জানেন যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে যত দিন গিয়েছে ততই দেশে সমস্ত ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনীর ধনসম্পদ লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়েছে, তারা জীবনযাত্রার দিক থেকে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশের সমান স্তরে, অথবা প্রায় সমান স্তরে পৌঁছেছে। অন্যদিকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষ ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আরও গরিব হয়েছে, গরিবী এবং গরিবের সংখ্যা ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গরিব মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না, রোগে ওষুধ পাচ্ছে না, আশ্রয়হীন হয়ে গোটা পরিবার নিয়ে রাস্তার ফুটপাথে এসে উঠছে। সন্তানের শিক্ষা তাদের কাছে বিলাসিতা। অথচ এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, এদের শ্রমেই প্রধানত গড়ে উঠেছে দেশের সম্পদ। এই বিশাল সংখ্যক গরিবের কেউ বা ধর্মের দিক দিয়ে হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বা বৌদ্ধ, জৈন; কেউ বা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ধর্মের বাইরের আদিবাসী সমাজের মানুষ, কেউ বা সমতলের, কেউ বা

চারের পাতায় দেখুন

বেআইনি মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে অ্যাবেকা

ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার পারচেজ কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের নামে মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১০ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের দপ্তরে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

ইরান ঃ মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টের নেপথ্যে

গত ৩ ডিসেম্বর এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করা গেল। যে মার্কিন প্রশাসন বেশ কিছুকাল যাবৎ ইরান পরমাণু বোমা তৈরি করছে বলে প্রবল সোরগোল তুলেছিল এবং তার পশ্চিমী মিত্রদের সাথে পালা করে প্রায় রোজ ইরানের প্রতি হুমকি বর্ষণ করে চলেছিল, হঠাৎ তাদেরই গোয়েন্দা দপ্তরের এক রিপোর্টে প্রকাশ পেল, ইরান সম্পর্কে তাদের এই অভিযোগ বাস্তবে একেবারেই বাজে কথা। ২০০৩ সালের পর নাকি ইরান তার পরমাণু বোমা প্রকল্প নিয়ে আর এক পা-ও অগ্রসর হয়নি। সেই প্রকল্পের কাজ তারা বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পরমাণু বোমা বানানোর জন্য ইউরেনিয়াম থেকে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম তৈরি করা দরকার, তাও নাকি বর্তমান প্রক্রিয়ায় ২০১৫ সালের আগে তাদের হাতে আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বর্তমানে সেদেশে চালু পরমাণু প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরিই অসামরিক।

১৬টি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা যুগ্মভাবে সম্প্রতি যে ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স এস্টিমেট বা এন আই ই রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতেই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। স্বভাবতই রিপোর্টটি সাম্প্রতিক বিশ্ব রাজনীতিতে যথেষ্টই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমেদিনেজাদ সঙ্গত কারণেই ৫ ডিসেম্বর 'আল জাজিরা নেট'-এ প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাতকারে একে ইরানের জয় বলে বর্ণনা করেছেন। ইরানের সাধারণ মানুষের মনোভাবও এই প্রসঙ্গে মোটামুটি একইরকম। অত্যন্ত লক্ষণীয় ঘটনা হল, এই এন আই ই গোয়েন্দা রিপোর্টেই ২০০৫ সালে সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলা হয়েছিল। ২০০২

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থার পরিণাম

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট কেলেঙ্কারি

ডিগ্রি কোর্সের পার্ট টু পরীক্ষায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে যদি ৩২ হাজার অকৃতকার্য হয়, পুনর্মূল্যায়ণ চেয়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরনা দেয়, তাহলে তা পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না কি? ২০০৫-'০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিগ্রি কোর্সে ১+১+১ ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের বক্তব্য ছিল, ছাত্রদের পড়াশুনার ভার এতে কিছুটা কমবে। পাশ কোর্সের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৪৫০, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে যথাক্রমে ৬০০ ও ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হলে ছাত্রদের ওপর চাপ লঘু হবে, যদিও শিক্ষাবিদরা এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, বর্তমান পরিকাঠামো নিয়ে এতদিন যেখানে পার্ট-১, পার্ট-২ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করাই অসুবিধাজনক বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলে আসছিলেন, সেখানে তিন দফায় প্রতি বছর পরীক্ষা হলে খাতার পরিমাণ বাড়বে, এত খাতা ভাল করে মূল্যায়নের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করবেন কীভাবে? ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্য থেকে এই প্রশ্নও উঠেছিল, ছাত্র ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করে যাচ্ছে, অথচ পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও শিক্ষকদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হচ্ছে না। বর্তমানে পরীক্ষার ফি-ও ব্যাপকহারে বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে গরিব-নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের ফি জোগাড় করতে অসুবিধা হচ্ছে। পরীক্ষার সংখ্যা বাড়লে তাদের ফি-ও দিতে হবে বেশিবার, যা জোগাড় করতে আরও অসুবিধা হবে। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে ছাত্ররা পড়াশোনার সময় বেশি পাবে বলে শিক্ষাদপ্তরের যুক্তিও ধোপে টেকে না। কারণ, প্রথম বর্ষ শেষে যখন পার্ট-১ পরীক্ষা, তখন তার প্রস্তুতির জন্য কলেজে পড়াশোনার দিন আগের চেয়ে অন্তত দু'মাস কমে যাবে। তাছাড়া দ্বিতীয় বছরে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা রেখে চাপ কমানো হল কীভাবে?

এসব কারণের জন্যই একটি গুরুতর অভিযোগ এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে উঠেছে। ছাত্রদের সুবিধা দেওয়ার অজুহাতে উচ্চশিক্ষা থেকে কার্যত তাদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর যে পরিকল্পনা, নয়া ব্যবস্থা কি তার ফলেই আনা হল? আগেকার পার্ট-১, পার্ট-২ — এই দুটি পরীক্ষার বদলে ৩টি পরীক্ষা হলে উচ্চশিক্ষায় ছাঁটাই আরও বাড়বে ছাড়া কমবে না। হিসাব করে দেখা গেছে, আগের দুই বছরের পাস কোর্সে ৫০ শতাংশ পাশ করলে ছাঁটাই হত ৫০ শতাংশ। এখন তিনটি পরীক্ষার প্রতিটিতে ৭৫ শতাংশ পাশ ধরলেও ছাঁটাই-এর সংখ্যা বাড়বেই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে ১০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে যথাক্রমে ছাঁটাই হবে ২৫, ১৯, ও ১৪ জন। এভাবে ১০০ জনে মোট ৫৮ জন পড়ার সুযোগ হারাবে। ফলে তথ্যের ভিত্তিতেই বলা যায়, তিন বছরের ব্যবস্থায় ছাত্রদের রেজাল্ট বিপর্যয় অনিবার্যই ছিল।

সাতের পাতায় দেখুন

গুজরাট নির্বাচনে এস ইউ সি আই-এর ফলাফল

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম যেখানে কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে লড়েছিল, সেখানে এস ইউ সি আই একক শক্তিতে, গণআন্দোলনের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল মেরুকরণের আবহাওয়ার মধ্যেও এককভাবে লড়াই করে এস ইউ সি আই প্রার্থীরা ভোট পেয়েছেন ঃ

চৌরঙ্গি (সুরাট)	—	১৩,৬০০ ভোট
এলিস ব্রিজ (আমেদাবাদ)	—	১,৭০০ ভোট
সয়াজিগঞ্জ (ভদোদরা)	—	৬০০ ভোট

বাঁকুড়ায় এস ইউ সি আই কর্মীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা খারিজ

বাঁকুড়ার ২৯ জন এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থক আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। গত ২০ ডিসেম্বর জেলা দায়রা জজ আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা কমিটির অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই সারা রাজ্যে বিক্ষোভের ডাক দেয়। ঐদিন বাঁকুড়ায় এস ইউ সি আই কর্মীরা পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখান এবং অতি দ্রুত ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ করে কর্মী-সমর্থকেরা দলীয় অফিসে ফিরে এলে সিপিএমের নির্দেশে পুলিশবাহিনী তাদের গ্রেপ্তার করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে। এই ঘটনায় জেলার নাগরিক সমাজ তীব্র ধিক্কার জানান। ১৫ দিন জেল হাজতে থাকার পর কর্মী-সমর্থকরা জামিনে মুক্ত হন। গত ২০ ডিসেম্বর এই মামলার রায় বেরোয়। বিচারক এঁদের নির্দোষ বলে মামলা খারিজ করে দেন। মামলায় জেলার আইনজীবী ও মুহুরীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে গণআন্দোলনের এই কর্মীদের পাশে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন। এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল গণআন্দোলনের কর্মীদের উপর পুলিশি হয়রানির তীব্র নিন্দা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি হচ্ছে।

পানশালায় মহিলা কর্মী নিয়োগ

সুপ্রিম কোর্টের রায় বিপজ্জনক

পাঞ্জাব আবগারি আইন ১৯১৪-এর ৩০ ধারা লঙ্ঘন করে সুপ্রিম কোর্ট পানশালায় মহিলাদের নিয়োগ এবং নিয়োগের বয়সসীমা ২৫ থেকে কমিয়ে ২১ বছর করায় সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী সম্প্রতি এক প্রেস বিবৃতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন দৃঢ়ভাবে মনে করে যেখানে মেধা, সংস্কৃতি এবং সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার অস্বীকৃত হচ্ছে সেখানে সমানাধিকারের নামে মহিলাদের পানশালায় নিয়োগ বাস্তবে সমানাধিকারের নিষ্ঠুর প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। এই রায়কে যে সব মহিলা সংগঠন স্বাগত জানিয়েছে তিনি তাদের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন, যখন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নাকের ডগায় এমনকী রাজধানীতে পর্যন্ত একের পর এক ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা ঘটছে সেখানে সেইসব সরকারকেই মহিলাদের নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করতে বলা সুপ্রিম কোর্টের একটা মামুলি সদিচ্ছা ছাড়া কিছু নয় এবং বাস্তবে তার মূল্য নেই। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিলের এবং পানশালায় মহিলাদের নিযুক্তি বন্ধ করতে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দাবি জানান। একইসাথে তিনি মহিলাদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁরা যেন তাঁদের প্রকৃত উন্নতি ও মর্যাদা হানিকর যে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণের বিরুদ্ধে সদাসতর্ক থাকেন।

কেমব্রিজ-ছাত্রীদের যৌনপেশা

অবক্ষয়ের মর্মান্তিক প্রতিচ্ছবি

কিছুদিন আগে 'ভার্সিটি' নামক কেমব্রিজের ছাত্রদের ম্যাগাজিনে প্রকাশ পেয়েছে যে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের ছাত্রীরা পড়ার খরচ জোগাড় করা ও একটু আরাম-আয়েসের জীবনযাপনের জন্য সানন্দে কলগার্ল, স্ট্রিপার বা পোল ড্যান্সিং-এ অংশগ্রহণ করছে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলীন্য হারানোর এই সংবাদ সকলকে হতচকিত করে দেওয়ার মতোই সংবাদ। কারণ, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ চাকরি করে না। এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুকরণীয় পদেই আসীন হয়। কিন্তু এই সংবাদে যে আশঙ্কা প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা হল, পুঁজিবাদের পচা-গলা সংস্কৃতির শিকার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের ছাত্রীরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেমন কান্ডারী হবে? ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ডিগ্রি অর্জন করা নয়, শিক্ষা আনে চেতনা, গড়ে তোলে উন্নত মূল্যবোধ। শিক্ষার এই সামাজিক তাৎপর্যের সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে মার্কসবাদী চিন্তাধারা। তার ভিত্তিতেই এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এবং এস ইউ সি আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন যে, একটা জাতি খেতে না পেলেও লড়ে যদি তার মনুষ্যত্ব থাকে। জাতির মনুষ্যত্ব গড়ে তোলার কারিগররাই যদি একটু আরাম আয়েসের জীবন আর শিক্ষা নামক পণ্যকে কেনার জন্য নিজেদের মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ নিজেরাই পদদলিত করে বা করতে বাধ্য হয় তাহলে তাদের কাছে শিক্ষা অর্জনের একমাত্র অর্থ দাঁড়ায়, যে কোনও প্রকারে ডিগ্রি কেনা। আর এই বার্তাই পৌঁছবে তাদের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে এদিকেই ঠেলে দিচ্ছে পুঁজিবাদ। অথচ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে দরিদ্রতম ছাত্র হিসাবে এই কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগ দেন। ধোয়া-মোছার কাজ নিয়েছিলেন তিনি। নিজের পড়ার খরচ চালানোর জন্য মেধাবী নিউটন অন্য ছাত্রদের চাকরের কাজও করেছেন। জ্ঞানের সাধনা ছিল তাঁর কাছে একটা সংগ্রাম। পরবর্তীকালে নিউটন ঐ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই লুকাসিয়ান চেয়ার প্রফেসর হন ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যথার্থ রূপে কেমব্রিজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানোর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপে নবজাগরণের ধারাবাহিকতায় সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ইরাসমাস, যিনি মার্টিন লুথারের আগে ইংল্যান্ডে নিউ টেস্টামেন্টের নতুন ভাষ্য লিখেছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ অধ্যায়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্লেটনিস্ট, নিউটনের উপস্থিতিতে খ্যাতির শিখরে ছিল।

সংবাদপত্রে সেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অধোগতির সংবাদ মনে করায় মার্কসের সেই অমূল্য শিক্ষা — ''The bourgeois has stripped off its halo every occupation hitherto honoured and looked up to with reverent awe''. অর্থাৎ, এতদিন যেসব পেশাকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখা হত, পুঁজিবাদ তার মহত্ত্বের আবরণ খুলে দিয়ে তাকে পুরোপুরি বেআব্রু করে দিয়েছে। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুঁজিবাদের সংকট যাতে মানুষ ধরতে না পারে সেজন্য সে মানুষের চেতনার স্তরেই থাবা বসিয়েছে আক্রমণের। পুঁজিবাদ শিক্ষাকে আজ যেমন পণ্যে পরিণত করেছে, তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ববোধকেও হত্যা করছে (সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১১ অক্টোবর, ০৭)।

আসাম রাজ্য ছাত্র সম্মেলন

তিনশ ঘন্টার বন্‌ধ সহ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ২৭-২৯ অক্টোবর প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র আসাম রাজ্য সম্মেলন। ২৭ অক্টোবর গুয়াহাটির 'লক্ষ্মীধর বরা ক্ষেত্রে' প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সভাপতি কমরেড অজিত আচার্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রকাশ্য অধিবেশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়, সহসভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, কমরেড অজিত আচার্য, কমরেড তুষার পুরকায়স্থ এবং এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। অধিবেশন উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল। তিনি বর্তমানে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্বারা শিক্ষা সংকুচিত করার যে অহরহ প্রয়াস চলছে তার বিরুদ্ধে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আধারে আসামের ছাত্র সমাজকে দেশের অন্য অংশের ছাত্রসমাজের সঙ্গে একাত্ম এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সভার প্রধান বক্তা প্রখ্যাত জননেতা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য দীর্ঘ বিশ্লেষণে আসামের জটিল রাজনৈতিক সংকটের কারণ ও তার সমাধানের সুনির্দিষ্ট পথ তুলে ধরেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, রাজ্য সম্পাদক কমরেড তুষার পুরকায়স্থ।

২৮-২৯ অক্টোবর গুয়াহাটির কুমার ভাস্কর নাট্য মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। রাজ্যের ১৪টি জেলা থেকে ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনের উদ্বোধক এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী অসুস্থতাজনিত কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ ভিডিও স্ক্রিনে শোনানো হয়। সম্মেলনে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তাব সহ শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

কমরেড ভব চক্রবর্তীকে সভাপতি এবং কমরেড জিতেন্দ্র চলিহাকে সম্পাদক করে ৬১ জনের আসাম রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

বিপিটিএ-র আন্দোলনের চাপে

বেতন পেলেন শিক্ষিকা

কলকাতা জেলার ১নং সার্কেলের শিক্ষিকা অনীতা দত্ত-র বেতন দীর্ঘ ১২ মাস যাবৎ বেআইনিভাবে সংসদ চেয়ারম্যান বন্ধ করে রেখেছিলেন। একটি বদলিকে কেন্দ্র করে এই মারাত্মক অবস্থা।

বাণী শিক্ষা সদন থেকে পাইকপাড়া শিক্ষায়তনে শ্রীমতী দত্তকে বদলি করা হয়। কারণ দেখানো হয়, বাণী শিক্ষাসদনের ছাত্র সংখ্যা কম। কিন্তু যে স্কুলে (পাইকপাড়া শিক্ষায়তনে) তাঁকে বদলি করা হয় সেখানকার ছাত্রসংখ্যা আরও কম, খাতা-কলমে মাত্র ২২ জন, বাস্তবে আরও কম। পক্ষান্তরে বাণী শিক্ষাসদনে খাতা-কলমে ৪৫ জন। তাই এই বদলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। কিন্তু সংসদ চেয়ারম্যান স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে তাঁর বেতন আটকে দেন।

গত ১৩ ডিসেম্বর এই বেআইনি বদলি ও বেতন বন্ধের প্রতিবাদে গড়িয়াহাটে অবস্থিত সংসদ কার্যালয়ে 'বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি'র নেতৃত্বে দেড় শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। অতঃপর আলোচনার টেবিলে চেয়ারম্যান এবং ডি আই উপস্থিত থেকে এই বেআইনি বদলি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন এবং বেতন রিলিজ করার কথা ঘোষণা করেন। শিক্ষক আন্দোলনে এ এক উল্লেখযোগ্য জয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকার অনুগামী শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং প্রশাসনিক কর্তারা উঠে পড়ে লেগেছিলেন যাতে এই বদলি প্রত্যাহার না হয়। কিন্তু সঠিক নেতৃত্বে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের কাছে তাঁদের পরাস্ত হতে হল।

এই সঙ্গে কলকাতার সংসদ কার্যালয় ও ডিআই অফিস গড়িয়াহাট থেকে কসবায় নিয়ে যাওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সাথে সাথে পিএফ-এর হিসাব, পিএফ লোন ও ফাইনাল পেমেন্ট অবিলম্বে প্রদানের দাবিরও স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

এদিনের বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিপিটিএ-র রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা, কলকাতার প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অজিত হোড়, জেলা সভাপতি বীরেন দেব ও জেলা সম্পাদিকা তপতী মিত্র প্রমুখ। রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা আন্দোলনের হাতিয়ার বিপিটিএ-র পতাকাতলে শিক্ষকদের সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

কাটোয়াতে সর্বদলীয় বৈঠকের প্রহসন

কাটোয়া মহকুমার ২৯টি মৌজার ৩৩টি গ্রামের বহুফসলি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার লক্ষ্যে বর্ধমান জেলাশাসকের ডাকে কাটোয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গত ১০ ডিসেম্বর সর্বদলীয় বৈঠকের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত এলাকায় কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বিগত দু'বছর ধরে আন্দোলনে সামিল ও সক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও এস ইউ সি আই'কে আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সংগঠনের কাটোয়া লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ৮ ডিসেম্বর কাটোয়া মহকুমা শাসক মারফৎ বর্ধমান জেলাশাসককে সঠিক ও সামগ্রিক আলোচনার স্বার্থে এস ইউ সি আই-কে সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে এক ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়। দুঃখের বিষয় তারপরও প্রশাসন এই বিষয়ে নীরব থেকেছে। প্রশাসনের এই পক্ষপাতমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা করে কমরেড অপূর্ব চক্রবর্তী ও কমরেড মহীতোষ কর্মকারের নেতৃত্বে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

এই বৈঠকে কৃষক ও খেতমজুরদের স্বার্থরক্ষাকারী নিজস্ব সংগঠন 'কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটি'কেও ডাকা হয়নি। জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে এই কমিটিকে বাইরে রেখে যেকোনও ধরনের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, অগণতান্ত্রিক। সিপিএম সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এলাকার বহুফসলি কৃষিজমি গ্রাস করার উদ্দেশ্যে পচ্ছন্দ মতো কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেদের একতরফা সিদ্ধান্ত ভুক্তভোগী চাষীদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়ার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ১০ ডিসেম্বর প্রায় এক হাজার কৃষক ও খেতমজুরের সুসজ্জিত এক মিছিল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বৈঠক চলাকালীন বিক্ষোভ দেখায়। নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায়, সহ সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে তপন ঘোষ, দেবু চ্যাটার্জী, কালিচরণ সর্দার, মুরহক শেখ ও হাসিবুল মণ্ডল; উপদেষ্টামণ্ডলীর পক্ষে অধ্যাপক ব্রহ্মপদ ব্যানার্জী ও বিশিষ্ট আইনজীবী অশোক দাঁ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে মোহাম্মদ জাকারিয়া ও অশোক চৌধুরী।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে

মুনাফাভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থাই দায়ী

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দু-সপ্তাহ ধরে প্রতিদিনই গভীর রাত পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার বালি-তে রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হল বিতর্ক। বিষয় ছিল, 'আবহাওয়ার পরিবর্তন বিশ্বের সামনে চ্যালেঞ্জ'। বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়নের যে ভয়াবহতা আতঙ্কের রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে, তাকে মোকাবিলার লক্ষ্যে সহমত প্রতিষ্ঠার জন্য একটি 'রোড ম্যাপ' তৈরিই ছিল উদ্দেশ্য। এই রোড ম্যাপ বা নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ২০০৯ সালে জার্মানির কোপেনহেগেনে উষ্ণায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি হবে। বালির এই বিতর্কে বিশ্বের ১৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন।

বালি সম্মেলনকে সফল করার জন্য এই বছরই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে ৩১ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত তিন দিনের আলোচনা চালানো হয়েছে, ২৭-৩১ আগস্ট পাঁচ দিনব্যাপী 'ভিয়েনা ক্লাইমেট টক' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমস্ত কার্যক্রমের লক্ষ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধ করা।

বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন

মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখছে, বিশ্বজুড়ে প্রকৃতির ভারসাম্য দারুণ বিপন্ন। শীত ও গ্রীষ্মের স্বাভাবিকতা থাকছে না। একদিকে প্রবল বর্ষণ ও বন্যা, অন্যদিকে ভয়াবহ খরা গ্রাস করছে পৃথিবীকে। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় সহ উষ্ণমণ্ডলীয় তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ ও সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে। ভারতীয় উপমহাদেশেও মাঝেমধ্যেই হানা দিচ্ছে 'সিডার'-এর মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। ভীষণ তাপ, তাপপ্রবাহ, ভারী শিলাবৃষ্টির ঘটনা বাড়ছে। এমন ওজনের শিলা এখনই পড়ছে, যা আগে কেউ পড়তে দেখেনি। অস্বাভাবিক কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় ঢেকে থাকছে পৃথিবী। শস্য উৎপাদনেও পড়ছে তার প্রভাব। উৎপাদন মার খাচ্ছে। বাড়ছে উত্তাপ। উত্তাপ যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে জীবাণু ও ভাইরাসের প্রকোপ, বাড়ছে দুরারোগ্য ব্যাধির হার। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর গঠনগত ও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটছে, অনেক উপকারী জীবাণুও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে, পেঙ্গুইনের মতো বিরল প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। উষ্ণতা যত বাড়তে থাকবে, এই ঘটনাগুলি ততই বৃদ্ধি পাবে।

উষ্ণায়নের কারণ

বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রধানত যানবাহন ও কল-কারখানার কাজে ব্যবহৃত খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি লাগামছাড়া হারে পোড়ানোর ফলে ব্যাপকহারে কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইডের মতো সর্বনাশা গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে। সেই গ্যাস প্রধানত ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন ১০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুস্তরে এত বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হচ্ছে যে, তা তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের বিকীর্ণ উত্তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারছে না। প্রায় পুরোটাই ফিরে এসে পৃথিবীর জল-স্থল-বায়ুকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করে তুলছে এবং যত দিন যাচ্ছে, এই গ্যাসের স্তর তত আরও বেশি ঘন হয়ে উঠছে। সে কারণেই বেড়ে চলেছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা।

উষ্ণায়নের মাত্রা দেখে বিজ্ঞানীরা আতঙ্কিত

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর, অর্থাৎ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির বর্তমান হার দেখে বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত ও চিন্তিত। উষ্ণতা বৃদ্ধির যে মাত্রা তাঁরা গত ক'মাস আগেও লক্ষ্য করেছিলেন, বর্তমানে সেই ভয়াবহতার মাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বহু গুণ বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা আরও উদ্বিগ্ন। আজ থেকে ১০ মাস আগে ২০০৭ সালের শুরুতে (২ ফেব্রুয়ারি) ১১৩টি দেশের সেরা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সম্মিলিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে গবেষণাধর্মী রিপোর্টটি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল — উষ্ণতা যে হারে বাড়ছে, তাতে ৯০ বছর বাদে সমুদ্র উপকূলস্থ বহু দেশ ও এলাকা জলের তলায় চলে যাবে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই উষ্ণতার এমন বৃদ্ধি ঘটে গেছে যে, তা আতঙ্কের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, গ্রিনল্যান্ডের বরফের স্তর দ্রুতহারে গলে যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যত্র যে হারে উষ্ণতা বাড়ছে, মেরু অঞ্চলে বাড়ছে তার পাঁচগুণ হারে। উত্তর মেরু সাগরের বরফ গত চার বছর আগে যে পরিমাণ ছিল, চলতি বছরের গ্রীষ্মের শেষে তার পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গেছে। এই বরফ-সমুদ্র এত দ্রুত গলছে যে, ৯০ বছর লাগবে না, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মাত্র ৩৩ বছর বাদেই ২০৪০ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ বরফ-সমুদ্রের সমস্ত বরফ গলে জলে পরিণত হয়ে যাবে। অন্যদিকে, আরও মারাত্মক কথা শুনিয়েছেন মার্কিন উপগ্রহ গবেষণা বিজ্ঞান সংস্থা নাসা-র বিজ্ঞানীরা। আবহাওয়া বিজ্ঞানী জে জোয়ালি বলেছেন, উপগ্রহ মারফত সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ৩৩ বছরও লাগবে না; যে হারে বরফ গলছে, তাতে আগামী ৫ বছরেই অর্থাৎ ২০১২ সাল নাগাদ উত্তরের বরফ-সাগর প্রায় বরফহীন হয়ে যেতে পারে। এই বরফ-সাগরে যা ঘটছে, তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। এই বরফ দ্রুত গলছে মানেই হল বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং শীতকালীন আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন। (সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৩-১২-০৭)। অর্থাৎ, বিশ্বের সমুদ্র উপকূলস্থ বিরাট এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়া, দেশে দেশে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, কালান্তক রোগের আক্রমণ ও মড়ক-মহামারীর পদধ্বনি দ্রুতবেগে বিশ্ববাসীর সামনে এগিয়ে আসছে। বিজ্ঞানীদের আতঙ্কের কারণ এখানেই।

এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতির থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন ঃ প্রথমত, গ্রিনহাউস গ্যাস রোধে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার এবং সেই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে গবেষণা চালানো দরকার। দ্বিতীয়ত, এই দূষণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গেই, ইতিমধ্যে জমে যাওয়া গ্রিনহাউস গ্যাসের স্তরকে কেমন করে লঘু করে দেওয়া যায়, তার জন্য 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট'ও জোরদার করতে হবে। অর্থাৎ একদিকে মনুষ্যসৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইডকে তার মূল উৎসগুলিতেই — যেমন থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, পরিবহন যান ইত্যাদিতেই শোষিত করে নেওয়া, বনাঞ্চল সৃজন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং বিদ্যুতের যথোপযুক্ত ব্যবহার, শক্তি সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তৃতীয়ত, কয়লা ও খনিজ তেল পোড়ানোটা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা দরকার। পরিবর্তে সৌরশক্তি ও অন্যান্য বিকল্প শক্তির সন্ধানে ও ব্যবহারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকা

কিন্তু, বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস যারা ঢেলে দিচ্ছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কাজ করতে অস্বীকার করেছে। 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচার'-এর পক্ষে অ্যানড্রু কার দেখিয়েছেন ঃ "গত দশকে আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছে, তার প্রায় অর্ধেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই। এই বৃদ্ধি চীন, ভারত, আফ্রিকা ও সমগ্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মোট বৃদ্ধির চেয়েও বেশি।"

১৯৯৭ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত কিয়োটো সম্মেলনে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার অঙ্গীকারপত্রে তারা সেদিন স্বাক্ষর করেনি। অজুহাত, আমেরিকার অর্থনীতি নাকি তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা এই যুক্তিও তোলে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি বেশি এনার্জি বা পেট্রোলিয়াম-কয়লা ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের এই বৃদ্ধি ঘটছে— এমনটা নয়। তারা অভিযোগ করেছে, অনুন্নত দেশগুলিতে যারা শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষিজমি বেশি ব্যবহার করে, সেখান থেকেই মিথেন নামে বিশেষ একটি গ্রিনহাউস গ্যাস আবহমণ্ডলে সঞ্চিত হচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। এই অজুহাতে তারা নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়াও এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, বিপজ্জনক গ্রিনহাউস গ্যাস সৃষ্টির মূল কারিগর আমেরিকা ও চীন আগে সতর্ক হোক। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিও আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকার উদাহরণ তুলে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

ইতালি, নেদারল্যান্ডস্, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটেছে মারাত্মকভাবে। শস্য উৎপাদনে, মানুষের জীবনে পড়েছে তার প্রভাব। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ঘোষণা করেছিল, তারা ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৩০ শতাংশ কমিয়ে ফেলবে, অবশ্য যদি অন্য রাষ্ট্র, বিশেষত আমেরিকা এবং চীন, মেক্সিকো, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার মত সম্ভাব্য বৃহৎ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র তাদের এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়। অর্থাৎ সাত মণ ঘি-ও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। বাস্তবে তারাও কিছু করেনি। সাহায্যের নামে তারা নিজেদের কল-কারখানা সহ নানা ক্ষেত্রের বিষাক্ত বর্জ্যগুলি চালান করে দিচ্ছে ভারত সহ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে।

বিশ্বকে উত্তপ্ত করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে পুঁজিবাদ

কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই এসব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে না। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ও জনসাধারণের থেকে ওঠা দূষণ নিয়ন্ত্রণের জরুরি দাবিকেও নানা অছিলায় নস্যাৎ করা হচ্ছে। কিন্তু কেন? দুনিয়ার রাষ্ট্রনায়করা ও শাসকরা আগত সর্বনাশ চোখের সামনে দেখেও দেখতে চাইছেন না কেন? এর কারণ হচ্ছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ও তাদের ক্ষমতাসীন সরকারগুলির লক্ষ্য জনগণের স্বার্থ রক্ষা নয়; তাদের লক্ষ্য — পুঁজিপতি-মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করা, তাদের পুঁজির লুণ্ঠনগতিকে আরও অবাধ ও লাগামছাড়া করে তোলা। পুঁজির ধর্মই হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে ছুটে চলা; এ না হলে পুঁজিবাদের মৃত্যু। পুঁজির মালিকরাও তাই যেভাবে হোক সর্বোচ্চ মুনাফার লালসায় ছুটছে। তাতে প্রকৃতি ধ্বংস হোক, মানুষ মরুক, সভ্যতা রসাতলে যাক — তাদের কিছুই যায় আসে না।

ফলে, ২০১২ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল, কার্যত তার কিছুই হয়নি। এবার আলোচনা হচ্ছে, ২০১২ সালের পরের পরিকল্পনা কী হবে — তাই নিয়ে। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে সে বিষয়ে সম্মেলন হবে। তারই 'রোড ম্যাপ' তৈরির জন্য এবার ডিসেম্বরে ১৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বিতর্ক। তার ফলও সেই হতাশাব্যঞ্জক। এ প্রসঙ্গে বালি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর দ্য পিউ (Pew)সেন্টার'-এর ডাইরেক্টর ইলিয়ট ডিরিঞ্জার মন্তব্য করেছেন, 'কেউ সেখানে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে যায়ওনি, এবং কেউ কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়ওনি'।

তবে, এবার একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়। অস্ট্রেলিয়া ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রোটোকল মানতে রাজি হয়েছে। বিপজ্জনক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রশ্নে কিয়োটোতে শিল্পোন্নত দেশগুলিকে দায়ী করে তাদের উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের যে কথা বলা হয়েছিল, এখন সে জন্য অপেক্ষাকৃত কম উন্নত রাষ্ট্রগুলিকেও দায়ী করে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তা দেখে এবং সমগ্র দেশজুড়ে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠায় শেষপর্যন্ত আমেরিকা তার দায়িত্বের বিষয়টি ভেবে দেখতে রাজি হয়েছে। এই পর্যন্ত।

সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদ এখন আরও ধ্বংসের পরিকল্পনায়

এখন তো পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবেলা-ওবেলার সঙ্কটে আবর্তিত হচ্ছে; সর্বব্যাপক সঙ্কটে ডুবছে। সঙ্কট থেকে বাঁচতে বিশ্বজুড়ে লুণ্ঠনের নয়া লক্ষ্যে পুঁজিবাদ 'বিশ্বায়ন'-এরও আমদানি করেছে। তাতেও তীব্র বাজার সঙ্কট থেকে রেহাই নেই। পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা — কে কত কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে মুনাফা অর্জনের বিষয়টি ভাববার সুযোগ তাদের নেই। এই মুহূর্তের, অর্থাৎ আশু মুনাফাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। পরে কী হবে — তা ভাবার অবকাশ নেই। তাই আশু সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য যত নিচে নামতে হয় তারা নামছে। সর্বোচ্চ মুনাফাই তাদের স্বর্গ, তাদের ধর্ম, তাদের জীবন। দূষণ নিয়ন্ত্রণের যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের দাবি উঠছে — তা ব্যবহার করতে হলে তো অর্থ খরচ করতে হবে; সেই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করার জন্য গবেষণা করতে হলে তাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, অথচ তা থেকে আশু কোন মুনাফা হবে না, শুধু খরচ। অর্থাৎ, মুনাফার হারে টান পড়বে।

সব পুঁজিবাদী দেশের সরকারের এক রা। পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তারা প্রয়োজনে পরিবেশের আরও দূষণ ঘটাবে, আফগানিস্তান বা ইরাকের যুদ্ধের মত আরও যুদ্ধের সৃষ্টি করবে, পরিবেশে আরও গ্রিনহাউস গ্যাস ঢেলে দেবে, আরও অসংখ্য কার্গিল যুদ্ধের আবহাওয়া রচনা করবে; কিন্তু মুনাফা কমিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার পথ, মানুষকে বাঁচানোর পথ তারা মাড়াবে না। মুনাফার লালসাই তাদের আরও পরিবেশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

'উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা', 'মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা', বা যে নামেই প্রচার করা হোক না কেন, আমাদের এই চলতি ব্যবস্থার চরিত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটবে না, কারণ এটা সেই মুনাফালিপ্সু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই। একমাত্র যে সমাজে এই পুঁজির শাসন নেই, উৎপাদন ও বন্টনের ওপর পুঁজির মালিকের মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মুনাফার স্বার্থে নয় — সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের স্বার্থেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হয়, একমাত্র সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই মানুষকে প্রকৃতির অংশ হিসাবে বিবেচনা করে, মানুষের কল্যাণের জন্য প্রকৃতির কল্যাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং উন্নয়ন ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে মানব কল্যাণকে সুনিশ্চিত করে। অতীতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন সেই দৃষ্টান্ত বিশ্বের সামনে স্থাপন করেছিল।

রাজ্যের মুসলিম জনগণ বহু ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে

একের পাতার পর

পাহাড়িয়া। কিন্তু একদিক থেকে এরা সকলেই এক। তা হল, এরা সকলেই গরিব, সকলেই শোষিত। গরিব মানুষের আলাদা কোন জাত নেই, ধর্ম নেই। তাদের ভাগ করা হয় শাসন-শোষণ-দমনের স্বার্থে। এককালে সামন্তী রাজা-বাদশাহরা তাদের বিভক্ত করে শাসন করেছে, তারপর বিদেশি শাসক ইংরেজরা করেছে, এখন করছে পুঁজিবাদের রক্ষক স্বাধীন ভারতের শাসকেরা। গরিবদের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীকে কিছু বাড়তি উচ্ছিষ্ট দিয়ে তারা তাদের শোষণের পক্ষে টেনে এনেছে। তাদের ভাবানো হয়েছে তারা রাজার জাত, অথচ রাজার উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছুই তাদের জোটেনি।

শোষণমূলক সমাজের এই ধারা আজও চলে আসছে। এখানে শুধু বঞ্চনা আছে তাই নয়, বঞ্চনাটাও সমানভাবে নেই। বঞ্চিতদের মধ্যেও রয়েছে অতি বঞ্চিত গোষ্ঠী, যেমন দলিত, আদিবাসী, পার্বত্য উপজাতি বা মুসলিম সম্প্রদায়। সাচার কমিটির সমীক্ষার পরিধি যাই হোক না কেন, কমিটি তার দৃষ্টি শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ না রেখে পরিষ্কার মন্তব্য করেছে যে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে, তার অনেকগুলিই কেবল মুসলিমদের মধ্যেই নয়, অন্যান্য সোসিও-রিলিজিয়াস ক্যাটেগরির জনগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে। ১৯৯১ সালে বিশ্বায়ন ও নয়া আর্থিক নীতি চালু হওয়ার পর থেকে এই বৈষম্য আর বঞ্চনা বেড়েছে অতি দ্রুতগতিতে; সাচার কমিটির রিপোর্টে তার স্বীকৃতি রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে — মুসলিম জনগণের মধ্যে একটা বড় অংশ যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং সেই ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা যেহেতু প্রায় নেই, তাই উদার আর্থিক নীতির (অর্থাৎ বিশ্বায়নের নীতির) তীব্র আঘাত, অন্যান্য নিচের তলার মানুষের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের গরিব মানুষের উপরেও নেমে এসেছে।

স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের এহেন দুর্দশা বহু দরদী মানুষকেই ভাবাচ্ছে। কমিশনের পর কমিশন বসেছে, হাজার হাজার পাতা রিপোর্ট এসেছে, যার ওপর বছরের পর বছর শুধু ধুলো জমেছে। কমিশনের সুপারিশ কখনও কার্যকর করা হয়নি, কখনও বা ভোটের স্বার্থে বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে সংরক্ষণের মতো সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে, কিন্তু তাতে গরিবের অবস্থা ফেরেনি। দেশের বেশ কিছু রাজ্য ঘুরে সরেজমিনে অবস্থা পরিদর্শন করে এবং উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, দিল্লি, রাজস্থান, অন্ধ্র, কর্নাটকের সরকারি দপ্তর, নানা এন জি ও এবং মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে বিচারপতি সাচার ১৭ নভেম্বর ২০০৬ রিপোর্ট পেশ করেন। ভারতে বেশিরভাগ গরিব মুসলিমের যে চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা এই রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে, তা ভারতের তথাকথিত সাম্য ও সমানাধিকারের মুখোশ একটানে খুলে দিয়েছে।

এই রিপোর্টের পর সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুরবস্থার কথা জানার জন্য উল্লেখযোগ্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কারণ, একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যাপক সংগ্রামী মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি ছাড়া সংখ্যালঘুদের অবস্থার উন্নয়ন বা তাদের দাবি আদায় সম্ভব নয়, তেমনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্দশার প্রতি উদাসীন থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শোষিত মানুষও মুক্তির সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস বা তার মিত্র মেকি মার্কসবাদী সি পি এম সহ ভোটের কারবারি রাজনৈতিক দলগুলি সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে খুব হৈচৈ করছে। সংখ্যালঘুদের ত্রাতা সাজতে সাচার কমিটির বক্তব্যকে কাজে লাগাচ্ছে। বিশেষ করে এ'রাজ্যে শাসকদল সিপিএম কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা ও নন্দীগ্রামের গণহত্যার পরে সংখ্যালঘুদের কাছে ক্রমাগত অপ্রিয় হয়ে পড়ছে বুঝতে পেরে সংখ্যালঘুদের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছে। অথচ বাস্তবে তারা কী করছে? কেন্দ্রীয় সরকার একাদশ যোজনার পূর্বঘোষিত খরচ বহাল রেখে তার ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু উন্নয়নের কাজে ব্যয় করার কথা ঘোষণা করেছে। তাছাড়া মুসলিমদের মধ্যে তীব্র বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলেছে। কিন্তু বিষয়টা কি এইরকম যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক নেই বলে বহু চাকরি পড়ে আছে? ট্রেনিং নিলেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হয়ে যাবে? গোটা দেশে যেখানে চাকরি নেই, রোজ যেখানে ছাঁটাই হচ্ছে, কোটি কোটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা যেখানে বেকার, সেখানে নিছক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা যদি সত্যিও করা হয়, তাতেও সংকটের কোন সুরাহা ঘটবে না। অন্যদিকে যে রাজ্য সরকার প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পের টাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বা সড়ক উন্নয়নের মতো কর্মসূচি ঘোষণা করার বেশি কিছু করছে না, তারাও নানাভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন ভেজানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসবই তারা করছে ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য সি পি এম সংখ্যালঘু জনগণকে প্রতারণার পথই যে নিচ্ছে সেটা দেশের মানুষকে, বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝতে হবে।

তথাকথিত মুসলিম তোষণের প্রচার মিথ্যা প্রমাণ হল

মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে এদেশে বহুল প্রচলিত কতকগুলি ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়েছে সাচার কমিটির রিপোর্ট। প্রথমত, মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এদেশে বহু মানুষ মনে করেন যে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম তোষণের নীতি নিয়ে চলার ফলে মুসলিমরা বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসাবে লালিত পালিত হয়, তুলনামূলক বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বঞ্চনার শিকার। 'মুসলিম তোষণের' প্রচারের মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যতা থাকলে, ষাট বছর বিশেষ সুবিধা ভোগ করার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের এত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হওয়ার কথা নয়, যে দুর্দশার চিত্র সাচার কমিটি তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরেছে। দ্বিতীয়ত, আর একটা ভুল ধারণাও বহুল প্রচলিত, যেটি তৈরি হয়েছে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের মিথ্যাপ্রচারের দৌলতে। তা হল, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা যথেষ্ট ভাল অবস্থায় আছে। সাচার কমিটি তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছে — বাস্তব সত্যটা ঠিক বিপরীত। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা বহু ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। দেখা যাক সাচার কমিটি কী কী বলেছেঃ

আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা বিচার করে সাচার কমিটি দেখিয়েছে যে, প্রশাসনে অংশগ্রহণ, উচ্চপদে চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবদিক থেকেই ভারতীয় মুসলিমরা পিছিয়ে আছে। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ হল মুসলিম। অথচ সরকারি হিসাবে সমগ্র দেশে সাক্ষরতার হার যেখানে ৬৫ শতাংশ, সেখানে মুসলিমদের মধ্যে সাক্ষরতা ৫৯ শতাংশ। ৬ থেকে ১৪ বছরের মুসলিম বালকদের মধ্যে ২৫ শতাংশই হয় কোনদিন স্কুলেই যায়নি, নয়ত পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ভারতে সমগ্র জনসংখ্যার ৭ শতাংশ যেখানে কলেজ শিক্ষায় যায়, সেখানে মুসলিমদের মধ্যে এই সংখ্যা ৪ শতাংশ। গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমাধারীর জাতীয় গড় যেখানে ৭ শতাংশ, সেখানে মুসলিমদের মধ্যে এই সংখ্যা ৪ শতাংশেরও কম। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিমদের পশ্চাদপদতার কথা এর আগেও নানা সমীক্ষা থেকে জানাই ছিল, এক্ষেত্রে সাচার কমিটি নতুন কিছু বলেনি। কিন্তু কেন এই পশ্চাদপদতা? এ সম্পর্কে বহুলপ্রচলিত একটা ভুল ধারণা সাচার কমিটি ভেঙে দিয়েছে।

অনেকেই মনে করেন, ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে মুসলিম পরিবারের অভিভাবকরা শিশুদের সাধারণ স্কুলে পাঠানোর বদলে মাদ্রাসা বা মক্তবে পাঠাতেই বেশি পছন্দ করেন। এই কারণেই সাধারণ স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্রছাত্রী আসে কম। সাচার কমিটি দেখিয়েছে, এই ধারণা পুরোপুরি ভুল। ভারতীয় মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ৪ শতাংশেরও কম মাদ্রাসায় পড়তে যায়। সাধারণ স্কুলে পড়াশুনার উপর বাড়তি কেউ কেউ ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠের জন্য মক্তবে যায়, তবে তা সাধারণ শিক্ষার বিকল্প হিসাবে নয়। তাহলে মুসলিমদের শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা কেন? সাচার কমিটি সরাসরি তার উত্তর না দিলেও তাদের রিপোর্ট থেকে তা বোঝায় কোন অসুবিধা নেই। সাচার কমিটি দেখিয়েছে, দেশে উর্দু মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে মুসলিমদের দারিদ্র্যের যে চিত্রটা পাওয়া যায়, তা থেকে শিক্ষায় পশ্চাদপদতার কারণ বোঝা আদৌ কঠিন নয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট (২০০৪-০৫) অনুযায়ী সারা দেশে গড়ে ২২.৭ শতাংশ দরিদ্র হলেও মুসলিমদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা হল ৩১ শতাংশ।

সামগ্রিক এই পশ্চাদপদতার কারণেই সরকারি বা উচ্চপদে চাকরির ক্ষেত্রেও মুসলিমরা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের থেকে পেছিয়ে। আমরা আগেই বলেছি, ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুসলিমদের সংখ্যা হল মোট জনসংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ। অথচ আই এ এসদের ৩ শতাংশ, আই পি এসদের ৪ শতাংশ, আই এফ এসদের ১.৮ শতাংশ এবং রেল কর্মচারীদের মাত্র ৪.৫ শতাংশ হল মুসলিম। বর্তমান লোকসভার ৫৪৩ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম সদস্যের সংখ্যা হল ৩৬ জন। সেনা, পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মরতদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা নামমাত্র। কেন্দ্র পরিচালিত নিরাপত্তাবাহিনীতে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশ, যেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ৪২ শতাংশ। বিষয়টা এইজন্য বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ যে, বোম্বাই দাঙ্গার নেপথ্য সত্য অনুসন্ধানের জন্য গঠিত শ্রীকৃষ্ণ কমিশন সহ নানা কমিশন তাদের রিপোর্টে নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছে। এর প্রতিকার কী? এই প্রশ্নে যাঁরা নিরাপত্তাবাহিনীকে পক্ষপাতহীনভাবে গড়ে তোলা এবং পক্ষপাতিত্বের অপরাধে শাস্তিবিধানের পরিবর্তে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বাড়াবার কথা বলেন, তাঁরা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতিরই পুনরাবৃত্তি করেন। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারি বাহিনীর সেক্যুলার চরিত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়, এর কোনও দ্বিতীয় বিকল্প নেই।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের অবস্থা জাতীয় গড়ের তুলনায় খারাপ

সাচার কমিটি আরও একটি সুপরিকল্পিত মিথ্যা প্রচারের মুখোশ খুলে দিয়েছে। সাচার কমিটি সরাসরি না বললেও এই রিপোর্ট জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুরবস্থার প্রতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, তার ফলে বহু তথ্য সামনে আসছে। যেমন, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রদত্ত তথ্য (২০০৪-০৫) দেখিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরা সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের সুশাসনে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে আছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার এই প্রচার নিছকই প্রতারণা মাত্র। শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের জাতীয় গড় যেখানে ১২ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে মুসলিমদের দারিদ্র্যের হার ২৭ শতাংশ, গ্রামাঞ্চলে ৩৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম শিশুদের ৯৮.৩ শতাংশ এবং সন্তানসম্ভবা মায়েদের ৯৮.৬ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা পিছিয়ে আছে। এ'রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার সরকারি হিসাবে ২৭.৬ শতাংশ, অথচ মুসলিমদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার হল ৪২.৫ শতাংশ।

সাচার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে — পশ্চিমবঙ্গে ১ থেকে ২ হাজার মুসলিমের বাস এমন ১১৬১টি গ্রামে কোন প্রাথমিক স্কুল করা হয়নি, ২০০৬ সালের পরে এইসব গ্রামে কিছু শিশুশিক্ষা কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন আগেই দেখিয়েছি, কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত এইসব শিক্ষাকেন্দ্র প্রথাগত স্কুলশিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ২৫.২৫ শতাংশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ২৩.৭৩ শতাংশ মুসলিম, ১১শ-১২শ শ্রেণীতে এসে সংখ্যাটা কমে দাঁড়াচ্ছে ৯ শতাংশ (সূত্রঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয়শিক্ষা দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫-০৬)। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উর্দুতে করতে হবে — এরাজ্যে উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীদের এই দাবি দীর্ঘদিনের, যা নিয়ে ছাত্রসংগঠন ডি এস ও দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। রাজ্য সরকার এই ন্যায্য দাবিটি মানতে নারাজ। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও কমে হয়েছে ৩.০৭ শতাংশ এবং সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ২.১ শতাংশ।

সাচার কমিটির রিপোর্ট সর্বস্তরের মানুষের সামনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এইসব তথ্য এনে দেওয়ায় সি পি এম ফ্রন্ট সরকার খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে। বিচারপতি সাচার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নানা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবাদী পক্ষে থাকেন বলে বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজের মতো সি পি এম সরাসরি এই রিপোর্টকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলতে পারছে না। অথচ সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুসলিম ভোটের কথা মাথায় রেখে কিছু তাদের করতেই হবে, যাতে সাচার কমিটির রিপোর্টের প্রভাব খানিকটা হলেও লঘু করে দেওয়া যায়। তাই এতদিন মুসলিমদের দুরবস্থার সুরাহা করার জন্য কিছু না করে, এখন সাততাড়াতাড়ি বারোটি মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় সমীক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার ইন্সটিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সেসকে নিযুক্ত করেছে। সাচার কমিটির রিপোর্টের পটভূমিতে সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি দাবি করেছেন, একাদশ পরিকল্পনায় মোট উন্নয়ন খরচের ১৫ শতাংশ মুসলিমদের জন্য ব্যয় করতে হবে। অথচ তিরিশ বছর সি পি এম শাসনের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের অবস্থা সর্বভারতীয় গড় থেকে এতটা নিচে কেন, সে প্রশ্নে তিনি নীরব। এর দ্বারা সি পি এমের দেউলিয়া রাজনীতি আরও একবার প্রমাণিত হল।

কাজেই সাচার কমিটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু না বললেও সমাজের একটি জানা, কিন্তু অবহেলিত অংশের প্রতি অপরাপর অংশের মানুষের চোখ

ছয়ের পাতায় দেখুন

গোয়েন্দা রিপোর্ট ঃ মার্কিন প্রশাসনের একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ

একের পাতার পর

সালের রিপোর্টে 'ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র' পাওয়ার দাবি করার তিন বছরের মাথায় এরাই বলেছিল, ''ইরান গোপনে পরমাণু অস্ত্র বানাচ্ছে''। এর পরই জর্জ বুশ ইরানকে লক্ষ করে যুদ্ধের হুমকি দিতে শুরু করেন। এখন আবার সেই সংস্থাই ইরান পরমাণু অস্ত্র বানাচ্ছে না— এই রিপোর্ট দিয়ে নিজেরাই প্রমাণ করে দিল, তাদের আগের রিপোর্ট ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। অথচ সেই মিথ্যাকে ভিত্তি করেই বুশরা ইরানকে ধ্বংস করতে যাচ্ছিলেন। এখন আবার রিপোর্ট বদলে গেল কেন? কোনও নতুন তথ্য আবিষ্কার বা তথ্য ফাঁস হওয়ার কোনও ঘটনা এর পিছনে নেই। আসলে এই 'ভিন্ন রিপোর্ট' হচ্ছে, মার্কিন সামরিক দপ্তরের একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ, যার দ্বারা তারা রিপাবলিকান সরকারের ইরান আক্রমণের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে চায়। এই রিপোর্টের পিছনে তাহলে কারা আছে? ১৭ ডিসেম্বর টাইম পত্রিকা লিখেছে, ''মার্কিন স্বরাষ্ট্র ও সামরিক দপ্তর এবং সামরিক বাহিনীর কর্তারা একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তেহরানের মতো মার্কিন বিরোধী ভয়ঙ্কর শক্তিকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক পথটাই সর্বোত্তম।''

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে চলতে থাকা এক তীব্র দ্বন্দ্বই রিপোর্টের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের একদিকে রয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ, উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি প্রমুখ, অপরদিকে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক বিভাগ খোদ পেন্টাগনেরই এক বড় প্রভাবশালী অংশ। উভয়পক্ষই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী হলেও এই মুহূর্তে মধ্য প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায় কোন পথটা শ্রেয় তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হল তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের উপর একাধিপত্য কায়েম করা। বুশ-চেনি জোট এই লক্ষ্যপূরণে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহী। ফলে ঐ অঞ্চলে একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসাবে ইরানের অস্তিত্ব তাদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। তার উপর ইরান নিজেও তৈলসম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তেলের আন্তর্জাতিক পাইপ লাইনগুলোরও এক বড় অংশ ইরানের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ফলে ঐ দেশকে নিজেদের সম্পূর্ণ কব্জায় না আনতে পারলে তেলের আন্তর্জাতিক বাজারের উপর মার্কিন একাধিপত্য স্থাপন করা যথেষ্ট কঠিন। সেই উদ্দেশ্যেই বুশ-চেনি জোট ইরানের বিরুদ্ধে এতটা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চলার পক্ষে।

কিন্তু পেন্টাগনের কাছে সমস্যাটি অন্যরকম। আপাতদৃষ্টিতে তাদের কাছে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে খুব একটা অসুবিধার কিছু নেই। সে দেশের পশ্চিমে ইরাক এবং পূর্বে আফগানিস্তান। দুটি দেশেই বর্তমানে রয়েছে তাদের সশস্ত্র উপস্থিতি। তদুপরি প্রযুক্তিগত দক্ষতায় বা উন্নত সমরাস্ত্রের দিক থেকে তাদের সাথে ইরানের কোনও তুলনাই চলে না। তার উপর প্রতিবেশী পাকিস্তান বা তুরস্কও মার্কিন জোটসঙ্গী। পারস্য উপসাগরে প্রস্তুত নিদেনপক্ষে ৩টি বিশাল মার্কিন বিমানবাহী রণতরী তথা পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জাহাজ। ফলে সামরিক দিক থেকে ইরানকে পিষে ফেলা মার্কিন সমরচক্রের কাছে প্রাথমিকভাবে খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তারপর?

যত গোলমাল এই 'তারপর' নিয়ে। পেন্টাগনেরও আসল ভয় এই 'তারপর'কেই। ইরাকে তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রামের মুখে পড়ে তাদের প্রাণ রীতিমতো ওষ্ঠাগত। বাস্তবিকই ইরাক ছেড়ে বর্তমানে তাদের পালাবার পথ খুঁজতে হচ্ছে। কীভাবে নিজেদের সম্মান বাঁচিয়ে ইরাক থেকে সরে আসা যায়, তা-ই এখন তাদের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা। তার উপর রয়েছে আফগানিস্তান। দখলদার বাহিনী হিসাবে সেখানেও তাদের অবস্থান খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়, সুখকর তো নয়ই। এর উপর যদি ইরান আক্রমণ করতে হয়, তবে মার্কিন বাহিনীর পক্ষে অবস্থা সামাল দেওয়া সত্যিই প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

সে ক্ষেত্রে গোটা ইরাক জুড়ে যে পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন বাহিনীকে পড়তে হবে, তা তাদের পক্ষে রীতিমতোই আতঙ্কজনক। তার উপর ইরানের দিক থেকেও যে পাল্টা প্রত্যাঘাত আসতে পারে, তা নিয়েও তারা যথেষ্ট চিন্তিত। গতবছর বুশ-চেনি প্রশাসন যখন মার্কিন বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফসের কাছে এ ব্যাপারে মতামত চায়, তখনও তারা সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছিল। এ ব্যাপারে তারা অনেকটাই নিশ্চিন্ত ছিল যে, মার্কিন বাহিনীর প্রবল বিমান আক্রমণের ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা ইরানি সেনাবাহিনীর খুব একটা নেই। ফলে প্রথম ধাক্কাতেই ইরানের তথাকথিত পরমাণু প্রকল্প এবং সেনা ও বিমানঘাঁটি মার্কিন বোমায় হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিল দেখা দেবে অন্যদিকে। প্রথমত, ইরান তার দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পাইপলাইনগুলি দিয়ে তেলের প্রবাহ বন্ধ করে দেবে। বিশেষত হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে সারা বিশ্বের তৈলবাণিজ্যই একরকম মুখ থুবড়ে পড়বে। এতবড় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও যথেষ্ট মুশকিল।

দ্বিতীয় কারণটি অবশ্য তারা অনুচ্চারিত রেখেছে, যদিও সেটি আরও বড়। তা হল ইরানের জনগণ। সংখ্যায় তারা ৭ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি। তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের ঐতিহ্যও দীর্ঘদিনের। ইতিহাসে সে কারণে প্রায় কোনও যুগেই কোনও বিদেশি শক্তির পক্ষে সে দেশে বেশি দিন তিষ্ঠোতে পারা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সে দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসও তার সাক্ষী। মাত্র ৩০ বছর আগে মার্কিন মদতপুষ্ট ইরানের অত্যাচারী শাহ জমানার অবসান ঘটেছে সে দেশের জনগণের তীব্র আন্দোলনের মুখে। এখনও তাদের স্বাধীনতাস্পৃহা একইরকম তীব্র। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘদিনের ক্রিয়াকলাপের ফলে তাদের মধ্যে মার্কিন বিদ্বেষও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থায় ইরান আক্রমণ করে সে দেশের সেনাবাহিনী বা সরকারকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হলেও, আসল বাধা ফিরে আসবে সে দেশের জনগণের কাছ থেকে। আর সে বাধা যে কী বস্তু, ইরাকে মার্কিন বাহিনী এখন প্রতিদিনই তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এর উপর ইরানে যুদ্ধ শুরু হলে আফগানিস্তান থেকে ইরান ও ইরাক হয়ে সেই সুদূর প্যালেস্তাইন পর্যন্ত সর্বত্র এক তীব্র মার্কিনবিরোধী যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে, যে অখণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জনগণই হয়তো দাঁড়িয়ে পড়বে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে। কোনও উন্নত প্রযুক্তি বা অস্ত্রের জোরেই সে যুদ্ধে জেতা যে মার্কিন বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়, তা তারা নিজেরাও ভালই বোঝে।

এর উপর আবার তাদের কাছে গোদের উপর বিষফোঁড়া হল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীর ক্রমাগত পড়তে থাকা মনোবল। যত দিন যাচ্ছে, সকলেই বুঝতে পারছে ইরাকে জয়ের সম্ভাবনা কতটা সুদূর। ফলে হাজার চেষ্টা করেও সেখানে মার্কিন সেনাদের মনোবল ধরে রাখা যাচ্ছে না। তার উপর আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র যুদ্ধবিরোধী মনোভাব। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, জনগণের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে এক ধরনের তীব্র অনীহা দেখা দিতে শুরু করেছে। তাই পেন্টাগনের অবস্থাও এখন কিছুটা নিরুপায়। সেই কারণেই বুশ-চেনি জোটের ইরানবিরোধী একরোখা মনোভাব অতি দ্রুত যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘনিয়ে তুলছিল, পেন্টাগনের কর্তাদেরই মদতে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে তার গোড়া কেটে ফেলার চেষ্টা করা হল।

তবে ইরানের বিপদ কেটে গেল, এ ভাবে ভাবাও কিন্তু হবে সম্পূর্ণ ভুল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের স্বার্থেই মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব খর্ব করতে এবং সে দেশকেই নিজ প্রভাবাধীনে নিয়ে আসতে আগ্রহী। কিন্তু গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তৈরি হওয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনের সামনে পড়ে এ তার সাময়িক পিছু হটা। কিন্তু তাতে তার চরিত্র বা লক্ষ্য কোনওটারই বদল ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই মার্কিন প্রভাবশালী কর্তাদের যাঁরা এই যুদ্ধের এখন বিরোধিতা করছেন, এমনকী তাঁরাও বাস্তবে ইরানকে কোনওরকম ছাড় দিতে নারাজ। যেমন নেব্রাস্কা থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান সিনেটর চার্লস হাগেল। 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইনটারন্যাশনাল রিলেশনস'-এ ইরান-মার্কিন সম্পর্ক বিষয়ে এক বক্তব্যে তিনি একদিকে যেমন বুশ-চেনি জোটের ইরান বিরোধী যুদ্ধোন্মাদনা ছড়ানোর তীব্র সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে ইরান সরকারকে শায়েস্তা করতে কিছু অন্য পন্থার প্রস্তাবও দিয়েছেন। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে আছে ইরান সরকারের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানো, বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে মদত যুগিয়ে সরকারের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা, অর্থাৎ বুশ-চেনি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য নীতিগত নয়, কৌশলগত। সরকারবিরোধী নানারকম আন্দোলনকে মদত দিয়ে দেশে অস্থিরতা তৈরি করা বা মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থাগুলোকে কাজে লাগিয়ে সে দেশে কোনও রকম ক্যু'এর আয়োজন করে মার্কিন মদতপুষ্ট কাউকে ক্ষমতায় আনা যায় কি না তার চেষ্টা করা প্রভৃতি। বলাবাহুল্য, সবকটি পন্থাই বাস্তবে ইরানের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত, যা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

অর্থাৎ, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে এই যে দ্বিধা, বা মার্কিন প্রশাসনের নিজেদের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, এর পিছনে আসলে আছে মধ্যপ্রাচ্য এবং খোদ আমেরিকার জনগণেরই তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন ও সংগ্রাম। জনগণের এই সংঘবদ্ধ সচেতন প্রতিরোধ আন্দোলনই হল যে কোনও দেশের স্বাধীনতার এবং শান্তির পক্ষে আসল গ্যারান্টি। সাম্রাজ্যবাদীরা একমাত্র এই আন্দোলনের চাপে বাধ্য হলেই পিছু হটে, এছাড়া তাদের সৃষ্ট যুদ্ধ বন্ধ করা সত্যিই অসম্ভব। (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকা ২০.১২.০৭ সংখ্যা)

রাজ্যে নাকি উন্নয়ন চলছে !

* আত্মহত্যায় সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম (সূত্র ঃ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান)
* কৃষকদের আত্মহত্যায় পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে ৬ষ্ঠ স্থানে (সূত্র ঃ ঐ)
* নারীপাচারে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম (সূত্র ঃ ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া-র পরিসংখ্যান — আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪ জুলাই '০৬)
* নারী ধর্ষণে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় (সূত্র ঃ ঐ)
* দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলছুটের সংখ্যায় সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম (সূত্র ঃ সরকারি সমীক্ষা)
* গ্রামাঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে ১১তম স্থানে (সূত্র ঃ বার্ষিক আর্থিক সমীক্ষা, ভারত সরকার)
* রাজ্যে রক্তাল্পতায় ভোগা শিশুদের অনুপাত ৭৮ শতাংশ, যা সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে বেশি (সূত্র ঃ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, '০৪)
* পশ্চিমবঙ্গে সেচযুক্ত কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ২৭ শতাংশ, যা বিহারের থেকেও কম।
* পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪৭ শতাংশ কৃষিশ্রমিকই ঋণগ্রস্ত (সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন, ১৭ নভেম্বর, '০৫)
* কর্মীসংকোচনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে (সূত্র ঃ প্রতিদিন ১৮ জানুয়ারি, '০৫)

শ্রমজীবী সংগ্রামী মঞ্চের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

বসিরহাট মহকুমা শ্রমজীবী সংগ্রামী মঞ্চের নেতৃত্বে ১১ ডিসেম্বর বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণহত্যাকারীদের গ্রেপ্তার, শাস্তি এবং নিহত-আহত ও ধর্ষিতা মহিলাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি চালুর দাবিতে এবং রেশন দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ এবং রেশন কার্ডধারীরা মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তা অনুসন্ধানপূর্বক বকেয়া খাদ্যশস্য দেওয়ার আশ্বাস দিলে ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়।

এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড তন্ময় বাইন (এস ইউ সি আই), কমরেড পৃথ্বীশ বোস (শ্রমজীবী সমন্বয় কমিটি), কমরেড রণজিৎ গায়েন (এম কে পি), কমরেড কৃষ্ণপদ ঘোষ (গণসংগ্রাম কমিটি), কমরেড খুশিলাল সরদার (পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি), কমরেড কল্পনা সরদার (শ্রমজীবী মহিলা সমিতি) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বীরভূমে বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গত ১ নভেম্বর বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকের শতাধিক বিড়ি শ্রমিক বিডিও অফিসে মিছিল করে এসে তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নেতৃত্ব দেন বীরভূম বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সদস্য এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুদ্দুস আলি। বিড়ি শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড জানমির খাঁ। কমরেড কুদ্দুস আলির নেতৃত্বে কমরেডস্ আরতি বৈরাগ্য, প্রতিমা বিশ্বাস, আশা হালদার, উত্তম কুন্ডু প্রমুখ ১০ জনের প্রতিনিধি দল বিডিওর অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট বিডিওর নিকট পরিচয়পত্র প্রদান, মজুরি বৃদ্ধি সহ ৬ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে। জয়েন্ট বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বীরভূম বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সদস্যপদ নেবার জন্য স্থানীয় সিটু নেতৃত্ব তথা সিপিএম এবং বিড়ি মালিকরা শ্রমিকদের ভীতি-প্রদর্শন করেও আন্দোলনের ঐক্য ভাঙতে পারেনি।

সংরক্ষণ কি মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে

চারের পাতার পর

খুলে দিয়েছে। সাচার কমিটির বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় অন্যান্য সমীক্ষার সূত্র ধরে এও বেরিয়ে এসেছে যে, মুসলিমদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি এবং সেই কারণে অচিরেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়বে — সংখ্যাগুরু মৌলবাদীদের এই প্রচারও পুরোপুরি মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারত সরকারের জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫১ সালে এদেশে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১০.৩৬ শতাংশ, ২০০১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৩.৪ শতাংশ। অর্থাৎ ৫০ বছরে মাত্র ৩ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার প্রচলন বাড়ছে, তা সত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকছে, তা হলেও মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে, অর্থাৎ আরও ৪৭ শতাংশ বাড়তে ৭৮৩ বছর সময় লাগবে।

এর আগে ১৯৮৩ সালে গোপাল সিংহ কমিটি ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তা সংসদে পেশ করতে দেয়নি। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সেই রিপোর্টেও মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে সাচার কমিটির রিপোর্টের প্রায় অনুরূপ তথ্যই ছিল। এছাড়াও সাচার কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুস-সালেহ-শরিফ, মুশির-উল-হাসান, রিতু মেনন সহ বহু বুদ্ধিজীবীর রচনায় ভারতের মুসলিম সমাজের চরম দুরবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছে। এদের সকলের আগে ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ প্রশাসক ডব্লু ডব্লু হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' বইতে লিখেছিলেন, সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের একমাত্র উচ্চ পেশা হল আইনব্যবসা, সামগ্রিকভাবে প্রশাসনে মুসলিমদের অংশ একের তেইশ ভাগ (৪.৩৪ শতাংশ)। তারা কুলি, সংবাদবাহক বা দোয়াতে কালি ভরার কাজ ছাড়া আর কোন চাকরি আশা করতে পারে না। কিন্তু এত সব বলার পরও হান্টার ব্রিটিশ সরকারের লাইনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংরক্ষণের দাওয়াইয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশবিরোধী ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং সুবিধা দেওয়ার ভাঁওতা দিয়ে মুসলিমদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে টেনে আনা।

সংরক্ষণের দ্বারা কি সমস্যার সমাধান সম্ভব

সাচার কমিটি তাদের সমীক্ষায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী মুসলিমদের তিন ভাগে ভাগ করেছে এবং দলিত মুসলিমদের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সুদীর্ঘকাল শোষণের শিকার তপসিলভুক্ত জনগোষ্ঠীর তুলনা করেছে। কিন্তু সংরক্ষণের প্রশ্নে সাচার কমিশন যে দ্বিধাহীন নয় তা বোঝা যায়, যখন দেখা যায় যে, রিপোর্টে বিচারপতি সাচার সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে দু-ধরনের মতই যে প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করেছেন। সর্বস্তরের মুসলিমদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ চালু করার সুপারিশ না করলেও শেষ-পর্যন্ত এই কমিটি দলিত মুসলিমদের সঙ্গে ওবিসি-ভুক্ত জনগণের যে তুলনা করেছে তা থেকে অনেকে এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন যেন, সাচার কমিটি দলিত মুসলিমদের জন্য ওবিসিদের মতো সংরক্ষণের সুপারিশ করেছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের চরম দুরবস্থা বহুলাংশে ভেদবুদ্ধিমুক্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরও যে ভাবাচ্ছে তার প্রমাণ হল — আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ারের মতো প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীও দলিত মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের পক্ষপাতী। যাঁরা মনে করেন, মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণই হল সমস্যার আশু সমাধানের রাস্তা, তাঁদের আমরা ভেবে দেখতে বলব, বিশেষ তালিকায় স্থান দিলে, কিংবা সংরক্ষণের সুযোগ পেলেই কি ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা বদলে যাবে? আজও যাঁরা মনে করেন, মুসলিমদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণই হল সমস্যা সমাধানের আশু রাস্তা, তাঁদের আমরা ভেবে দেখতে বলব, তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির জন্য বা অধুনা ওবিসিদের জন্য যে সাংবিধানিক সংরক্ষণ চালু আছে, তাতে কতজন প্রকৃত গরিব মানুষের উপকার হয়েছে?

সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, তেরো বছর আগে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, দেশের মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ ওবিসি হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২.৫৫ শতাংশ, তারপর তাদের জন্য ২৬ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হয়। তারপর তেরো বছর কেটে যাওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে, সরকারি চাকরিতে ওবিসিদের সংখ্যা বাড়েনি,বরং তা কমে হয়েছে ৫.২১ শতাংশ। এটাও গরিব ওবিসিরা পায়নি, পেয়েছে ওবিসিদের মধ্যে যারা কিছুটা ধনী, যারা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বহু টাকা খরচ করতে পেরেছে তারাই। গরিব ঘরের সন্তানরা স্কুলে যাওয়ার বয়সে খাটতে গেছে খনি-খাদানে, ইটভাটায়। সংরক্ষণ তাদের জীবনে আলো এনে দিতে পারেনি। সংরক্ষণের সুযোগে লাভবান হয়েছে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের মধ্যেকার মুষ্টিমেয় তুলনামূলকভাবে ধনী সম্প্রদায়। কাজেই অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে দিচ্ছে — আশু হোক, আর স্থায়ী হোক, সংরক্ষণের দ্বারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতার অবসান ঘটবে না। সংরক্ষণের ফাঁদে পা দিলে তাঁরা কেবল সংরক্ষণের সস্তা রাজনীতির শিকার হবেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতার অবসান ঘটাতে হলে সমস্যার মূলে যেতে হবে।

সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর চরম দুর্দশার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও তার সামান্যতম সুরাহা করার জন্য কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে, হঠাৎ করে ইউ পি এ সরকার সাচার কমিটির রিপোর্ট সামনে নিয়ে এসেছে কেন? সকলেই জানেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছে যে, বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের পাশাপাশি কংগ্রেস যেটা করে, সেটা হল নরম হিন্দুত্ব। অর্থাৎ দরদী সেজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক দখল, সাথে সাথে ১৩ শতাংশের সামান্য বেশি মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক যাতে অটুট থাকে সে সম্পর্কেও তারা সচেতন। কংগ্রেসের এই 'নরম হিন্দুত্বের লাইন' প্রকটভাবে শুরু হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর আমলের শেষদিক থেকে। মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার জন্য তিনি ভারতের মুসলিমদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে গোপাল সিংহ কমিটি গঠন করলেও কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত সেই কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে আনেনি। এরপরই রাজীব গান্ধী রামমন্দিরের তালা খুলে দিয়ে হিন্দু ভোট দখলের নোংরা খেলা শুরু করেন। ক্ষমতায় বসার পর ইউ পি এ জোট সরকারও মুসলিমদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ইত্যাদি কোনও প্রশ্নেই ইতিবাচক কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকী ২০০৬ সালের ১৭ নভেম্বর সাচার কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পর এক বছর কেটে গেলেও তারা কার্যকর কিছু করেনি। এ থেকেই পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে, সাচার কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পিছনে ইউ পি এ-র লক্ষ্য হল, সংখ্যালঘু দরদী সেজে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক দখল করা। তাই মুসলিম জনগোষ্ঠী শুধু নয়, সব ধরনের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দুর্দশাকে কাজে লাগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক দখলের ঘৃণ্য রাজনীতির স্বরূপ দেশের মানুষকে বুঝতে হবে।

সাচার কমিটির যে পর্যবেক্ষণগুলি জনচক্ষের আড়ালে থেকে যাচ্ছে

সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে দেশে যেসব আলোচনা হচ্ছে, তাতে যেমন বহু গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোকপাত ঘটেছে, তেমনি সাচার কমিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আলোচনায় উপযুক্ত গুরুত্ব পাচ্ছে না। যেমন সাচার কমিটি স্পষ্ট করেই বলেছে, মুসলিমদের যেসব সমস্যার দিকগুলি তারা তুলে ধরেছে, তার সবগুলি কেবল মুসলিমদের সমস্যা নয়, তাই সমীক্ষার এক্তিয়ারের বাইরে হওয়ায় সে সম্পর্কে বেশি কথা রিপোর্টে বলা হয়নি। সাচার কমিটির রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়লে যে কেউই বুঝতে পারবেন, মুসলিমদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওবিসিদের যেভাবে তুলনা করা হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা মুসলিমদের মতোই দুর্দশাগ্রস্ত। অর্থাৎ কোন্ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কত — তারা সংখ্যালঘু, নাকি সংখ্যাগুরু — তার উপর দুর্দশার মাত্রা নির্ভর করে না। প্রশ্ন থাকবেই, তাহলে তাদের সমস্যার মূল কারণ কী?

সাচার কমিটি দেখিয়েছে, সর্বদাই মুসলিম সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুর হীনমন্যতা এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়ার আতঙ্কে ভুগতে হয়। 'যারই দাড়ি আছে, সেই সন্ত্রাসবাদী' এই ধরনের প্রচলিত ধারণার চাপ নিয়ে তাদের চলতে হয়। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও নিজে একসময় বিজেপির মতোই বলেছিলেন — 'মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসবাদী তৈরির ঘাঁটি।' কাজেই এক্ষেত্রে রাজ্যের মুসলিমদের প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকসুলভ মানসিকতা আসলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক শোষণেরই কুৎসিত রূপ।

বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ'-এর অজুহাত তুলে তাদের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে গ্রহণযোগ্য করাতে চাইছে। এরকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের শোষিত জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির এই চক্রান্তকে রোখা দরকার — এটা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, চিরতরে এর অবসান ঘটানোর উপায় কী? সাচার কমিটি দেখিয়েছে, ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুখ ফেরানো, মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষায় পশ্চাদপদতার কারণ নয়। এর আসল কারণ হল, চরম দারিদ্র্য, তার সাথে আছে দ্বিভাষা সূত্রের নামে কেবল ইংরেজি, হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষার উপর একপেশে জোর দিয়ে উর্দু ভাষাকে গুরুত্বহীন করা। এ থেকে স্পষ্ট বেরিয়ে আসে যে, মুসলিম জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটার প্রশ্নটি দারিদ্র এবং ভাষাগত বৈষম্যের অবসান ঘটানোর সঙ্গে জড়িত। প্রশ্ন হল, দারিদ্র ও ভাষাগত বৈষম্য দূর করার উপায় কী? নিঃসংশয়ে এর উত্তর একটাই, তা হল পুঁজিবাদী শোষণের অবসান ঘটানো।

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, এককালে পুঁজিবাদী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য যেসব দেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সেসব দেশেও এখন পুঁজিবাদের সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য প্রকট হচ্ছে। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজনৈতিক সংকট যত বাড়ছে, জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যত কঠিন হচ্ছে, ততই গণআন্দোলনের ভয়ে ভীত বুর্জোয়াশ্রেণী — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনুসৃত ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি নিয়ে — হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ও বৈষম্যকে বাড়াবার রাস্তা নিচ্ছে। বিজেপি কাজটা করছে খোলাখুলি, উগ্র এবং নির্লজ্জভাবে, কংগ্রেস করছে ঢাকাচাপার আড়ালে। আর কংগ্রেসের দোসর সি পি এমও যে পিছিয়ে নেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ হল, নন্দীগ্রামের আন্দোলনে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির ঘৃণ্য চেষ্টায় শাহি ইমাম আহমেদ বুখারিকে ব্যবহারের অপচেষ্টা। কাজেই বিজেপি তো বটেই, এমনকী ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে দক্ষিণপন্থী ও তথাকথিত বামপন্থীদের বিভেদকামী ও বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষাকারী চরিত্রটি সংখ্যালঘু জনগণকে বুঝতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরের শোষিত মানুষের সাথে মুসলিম জনগণকে আরও একটা সত্য ভালোভাবে বুঝতে হবে, তা হল, যতদিন শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি চালু থাকবে, ততদিন শোষিত জনগণের অন্যান্য অংশের মতো তাদের জীবনের মূল সমস্যাগুলিরও সমাধান হতে পারে না। মুসলিমরা তফসিলি জাতি-উপজাতির মতো শোষিত জনগণের মধ্যেও চরম শোষিত একটা অংশ। কিন্তু তার মূল কারণ একটাই, তা হল পুঁজিবাদ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অসম বিকাশ এবং সংখ্যালঘু ও দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর উপর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক তীব্রতর শোষণ পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণাম। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনায় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যার কারণ নির্দেশ করে বলেছিলেন, ''সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই যেখানে একাধিক জাতি (ন্যাশনালিটি) বিদ্যমান, সেখানে অধিকতর প্রভাবশালী জাতি অন্য বা অন্যান্য জাতিসমূহকে দমন করে। সেইজন্য পুঁজিবাদের অধীনে জনসাধারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শোষণে নিষ্পেষিত হয় না, উপরন্তু জাতিগত নিপীড়নও তাহাদের সহ্য করিতে হয়। পশ্চিমী দেশগুলিতে বর্ণগত দাঙ্গা প্রভাবশালী জাতি কর্তৃক সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে এইরূপ দমনেরই অভিব্যক্তি'' (নির্বাচিত রচনাবলী, বাংলা সংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১)।

প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় অনেকটা একই ধরনের সমস্যা ছিল ইহুদি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে। বিশেষ ইহুদি স্বার্থের কথার দ্বারা ইহুদি জনগোষ্ঠীকে যারা প্রতারিত করার চেষ্টা করছিল, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লেনিন দেখিয়েছিলেন, শোষিত সকল অংশের জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ইহুদি জনগণ তাদের উপর বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারবে, অন্য কোনও পথে গেলে তাদের কেবল প্রতারিতই হতে হবে। বিশেষ ইহুদি স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার 'বান্ডিস্ট'দের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে লেনিন তাদের বৃহৎ অংশকে ব্যাপকতর রুশ সর্বহারা মুক্তি সংগ্রামের সাথে যুক্ত করেছিলেন। বান্ডিস্টদের একটি অংশ রাশিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি মিলতে চাইছিল না। তারা চাইছিল, স্বাধীন ইহুদি অঞ্চল গঠন করতে এবং তারপর রাশিয়ার সঙ্গে ফেডারেশন তৈরি করতে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা চাইছিল, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেহনতি মানুষের ব্যাপকতম ঐক্য। লেনিনের ঐক্যের আহ্বানের বিরোধিতা করে বান্ডিস্ট ফেডারেশনপন্থীরা বলেছিল, বলশেভিকরা ইহুদিদের 'গিলে ফেলার চেষ্টা' করছে। এই কথার দ্বারা তারা ইহুদিদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। বান্ডিস্টরা বলেছিল, ইহুদিরা কেবল বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর অংশই নয়, তারা ইহুদি জাতির অংশ, যে জাতির নিজস্বতা আছে। লেনিন দেখিয়েছিলেন, শোষিত ইহুদি জনগণকে বান্ডিস্টরা যে 'ইহুদি জাতির অংশ' হিসাবে দেখাতে চাইছে, তা মেহনতি মানুষের স্বার্থবিরোধী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সর্বহারা ইহুদিরা বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তাদের মুক্তির প্রশ্নটি বিশেষ ইহুদি স্বার্থ রক্ষার সাথে জড়িত নয়, বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দুনিয়ায় একমাত্র বিপ্লবোত্তর রাশিয়াই মার্কসবাদী আদর্শের ভিত্তিতে

সাতের পাতায় দেখুন

সাচার কমিটির রিপোর্ট

ছয়ের পাতার পর

লেনিনের শিক্ষায় ইহুদি সমস্যার বহুদূর সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল।

লেনিনের এই শিক্ষাকে স্মরণ করে এদেশের সাধারণ মুসলিম জনগণকে বুঝতে হবে, তাদের স্বার্থ, আর মুসলিম ধনীদের স্বার্থ, ইসলামের নামে যারা পুঁজিবাদী বেইমানদের মদতদাতা তাদের স্বার্থ, মানুষকে যারা অন্ধ আনুগত্যের শিকলে বেঁধে রাখতে চায় সেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের স্বার্থ এক নয়। স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে গরিব মুসলিমদের জীবন আর্থিক অভাব, সাংস্কৃতিক অধঃপতন এবং ক্রমাগত দাঙ্গায় বিধ্বস্ত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মুসলিম প্রাধান্য সত্ত্বেও মার্কিন অঙ্গুলিহেলনে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালাতেও দ্বিধা করেনি। পৃথক মুসলিম স্বার্থের প্রবক্তারা আসলে পুঁজিবাদী স্বার্থেরই রক্ষক। অথচ, পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে পৃথকভাবে মুসলিম জনগণের সমস্যার সমাধান কখনই করা সম্ভব নয়। একমাত্র ভারতের অন্যান্য শোষিত জনগোষ্ঠীর মুক্তির সঙ্গে ভারতীয় মুসলিমদের মুক্তির প্রশ্নটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত — এই মূল সত্যটা যারা আড়াল করে, তাদের সুবিধাবাদী রাজনীতি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কেবল প্রতারিতই করবে।

এই অবস্থায় পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক উন্নত সংস্কৃতির আধারে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনই একমাত্র এই সমস্যাকে চিরতরে সমাজজীবন থেকে নির্মূল করার পথ প্রশস্ত করতে পারে। একথা দুঃখের হলেও সত্য যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৬০ বছর পরেও, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া আমাদের দল এস ইউ সি আই ছাড়া আর কোনও দল উন্নত আদর্শ ও রুচি-সংস্কৃতির আধারে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেনি। এস ইউ সি আই-ই এদেশের একমাত্র সঠিক সাম্যবাদী দল হিসাবে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ও সেই আন্দোলনকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবী শ্রেণীচেতনার আধারে অপরাজেয় শক্তির অধিকারী করতে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস চেষ্টা করে চলেছে। এই উদ্দেশ্য থেকে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণীচেতনা গড়ে তোলার জন্য বিজেপি, কংগ্রেস ও তথাকথিত মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালাচ্ছে এস ইউ সি আই। অন্যদিকে বিজেপিকে রোখার অজুহাত দেখিয়ে মেকি মার্কসবাদী সি পি এম হাত মেলাচ্ছে কংগ্রেসের সাথে, যে কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িকতার কলুষ থেকে মুক্ত নয়। কংগ্রেসের মতো সি পি এমও সংখ্যালঘু ভোট দখলের উদ্দেশ্যে সাচার কমিটির রিপোর্টকে কাজে লাগাতে চাইছে।

আমরা আশা করি, মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এদের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির চালাকিতে বিভ্রান্ত হবেন না। তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট দখলের নিকৃষ্ট রাজনীতির স্বরূপ তাঁরা চিনে নেবেন। দেশের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার শরিক হয়ে তাঁরা নিজেদের শ্রেণী অবস্থান বুঝে নিয়ে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবেন।

ওড়িশা রাজ্য ছাত্র সম্মেলন

১৫-১৭ ডিসেম্বর, রাউরকেলায় সারা ভারত ডিএসও-র উদ্যোগে ওড়িশা রাজ্য ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বেতন বৃদ্ধি, যৌনশিক্ষা, গ্যাটস্, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে লিংডো কমিটির সুপারিশ, অশ্লীল সিনেমা-সংগীত-বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা দাবি তোলেন। তাঁরা দাবি করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে; কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ও রাজ্য বাজেটের ৩০ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে এবং সর্বশিক্ষা অভিযান বাতিল করতে হবে।

১৫ ডিসেম্বর রাউরকেলায় তিন হাজার ছাত্রের বিশাল সুসজ্জিত মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সভাস্থলে যায়। মিছিলের যাত্রাপথে এলাকার মানুষ স্থানীয় লোকসংগীতের মাধ্যমে ছাত্রদের অভিনন্দিত করেন।

সভার সূচনায় ছাত্র ও গণআন্দোলনের শহীদ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে প্রগতিশীল সাহিত্যিক কৃষ্ণচন্দ্র মিশ্র, বিশেষ অতিথি হিসাবে এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ছবি মহান্তি এবং প্রধান বক্তা হিসাবে ডিএসও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড রাজেন্দ্র বর্মা সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা শিক্ষাকে সংকুচিত করার সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। মনীষীদের উদ্ধৃতি সংবলিত এক সুদৃশ্য প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা প্রমীলা পাণ্ডা।

প্রতিনিধি সম্মেলনে ৬৬৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড তাপস দত্তের প্রেরিত বার্তা সম্মেলনে পাঠ করা হয়। সম্মেলন থেকে কমরেড অশোক মিশ্রকে সভাপতি, কমরেড ব্রজবন্ধু সাহুকে সম্পাদক এবং প্রভামঞ্জুলা ব্রহ্মাকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪৫ জনের রাজ্য কমিটি ও ১৩৬ জনের রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জগবন্ধু বড়াল প্রতিনিধি সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে শিক্ষা সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হিসাবে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক আদর্শের ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

ছত্তিশগড়ের দুর্গে ছাত্র সম্মেলন

গত ১১ ডিসেম্বর ছত্তিশগড়ের দুর্গ্ শহরের মালবীয় পার্কে অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ছাত্র সম্মেলন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই ছত্তিশগড় রাজ্য ইনচার্জ ও প্রবীণ নেতা কমরেড বাদশা খান। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র সর্বভারতীয় কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড মৃদুল দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দুর্গ্ শহর ডিএসও'র সভাপতি ও সর্বভারতীয় কাউন্সিল সদস্য কমরেড বিশ্বজিত হাড়োড়ে, দুর্গ্ সায়েন্স কলেজ ইউনিট সভাপতি কমরেড আত্মারাম সাহু এবং কমরেডস মহেন্দ্র কুমার, দেবেন্দ্র পটেল সহ অন্যান্য সংগঠক-কর্মীরা। বক্তারা সকলেই শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধি সহ অন্যান্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কমরেড আত্মারাম সাহুকে সভাপতি, কমরেড মহেন্দ্রকুমারকে সহসভাপতি ও কমরেড দেবেন্দ্র পটেলকে সম্পাদক করে ১০ জনের দুর্গ্ শহর এ আই ডি এস ও কমিটি গঠিত হয়।

চিঙ্গানি গ্রামের মাসিমা'র জীবনাবসান

বাঁকুড়ার ওন্দা থানার চিঙ্গানি গ্রামের মিলনবালা মণ্ডল ৮২ বছর বয়সে গত ১ ডিসেম্বর কলকাতার সামরিক হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এস ইউ সি আই-এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দলের কাজে যত সক্রিয় হয়েছেন, তাঁদের আচার-আচরণে এবং দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে দেখার মাধ্যমে এই দলের রাজনীতির ভিতর যে উন্নত সংস্কৃতি নিহিত, তার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। দলে যুক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর পরিবারে কোনও অনুষ্ঠানেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি, জাতপাতের সংস্কার লক্ষ্য করা যায়নি। ওন্দা থানার পূর্বতন আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কমরেড স্বপন মণ্ডলের অকাল মৃত্যুতে তাঁর পরিবারে কোনও লৌকিক আচার পালন করা হয়নি। তাঁর বাড়িতে দলের কর্মীদের ছিল অবাধ এবং অনায়াস যাতায়াত। প্রয়াত মিলনবালা মণ্ডলের বিরল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। ১৭ ডিসেম্বর চিঙ্গানি গ্রামের মল্লিক মেলায় আয়োজিত তাঁর স্মরণসভায় দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন, জীবনে অনেক মা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে একজন এই মাসিমা চলে গেলেন। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী বলেন, মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়া শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল এবং সিপিআই-এম এল (এনডি)'র পক্ষ থেকে কমরেড ভোলানাথ শীট। সভাপতিত্ব করেন গ্রামের প্রবীণ মানুষ ফকিরচন্দ্র মল্লিক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট কেলেঙ্কারি

একের পাতার পর

প্রথম বছরেও এটাই ঘটেছে। এবছরও রেজাল্টে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে ছাত্ররা। এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ/বিএসসি, পার্ট-১ ও পার্ট-২ (১+১+১) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার। রেজাল্ট বেরোনোর পর রিভিউ-এর জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা দেখা গেল কমপক্ষে ৩২,০০০। অকৃতকার্য হওয়ার সংখ্যাটা চমকে ওঠার মতো। প্রথম বছরে তড়িঘড়ি সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার দিন ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেও, এবছর আরও বড় বিপর্যয় ঘটে গেল। আসলে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে না তুলে, শিক্ষাবিদদের মতামতের তোয়াক্কা না করে, শিক্ষাব্যবস্থার ধাপে ধাপে যখন-তখন পরিবর্তন এনে এবং শিক্ষকদের উপর পরীক্ষা গ্রহণ ও খাতা দেখার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে ছাত্রদের সর্বনাশের মাত্রা আরও বাড়িয়ে চলেছে শিক্ষাদপ্তর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে গেলেই 'রিভিউ ফর্ম' হাতে উদ্বিগ্ন ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় এবং অভিভাবকদের অসহায় মুখ সেকথাই প্রমাণ করে।

তথাকথিত শিক্ষায় যেখানে মেধা নয়, টাকাই মাপকাঠি — সেখানে রেজাল্টে ব্যাপক অসঙ্গতি, তার উপর সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা স্বভাবতই ছাত্রদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে তারা। এই পরিস্থিতিতে অবশ্য 'পঞ্চাশ লক্ষ ছাত্র সমর্থকের' দাবিদার 'সর্ববৃহৎ' ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর দেখা ছাত্ররা পায়নি। তারা অনশনের কাগুজে ছমকি দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে। প্রকৃত ছাত্র আন্দোলনের শক্তি এ আই ডি এস ও'কেই ছাত্ররা পাশে পায়। কলকাতা জেলা ডিএসও'র উদ্যোগে বিরাট সংখ্যক 'অকৃতকার্য' ছাত্রছাত্রী ৪ ডিসেম্বর পরীক্ষা নিয়ামকের অফিসে বিক্ষোভ দেখায়, সুবিচারের দাবি জানায়। সমস্যার আশু সমাধানের আশ্বাস পাওয়ায় ছাত্ররা ফিরে আসে। ছাত্র বিক্ষোভকে ধামাচাপা দিতে তড়িঘড়ি কমিশন গঠন এবং সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা নিয়ামক ওঙ্কারসাধন অধিকারী-কে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে ইউজিসি কাউন্সিল। কমিশনের রিপোর্ট কতদিনে প্রকাশ পাবে, আর পরীক্ষার্থীরাই বা তার কোনও সুফল পাবে কি না, সেকথা নিশ্চিত করে বলার সাধ্য কারও নেই। এর আগেও রেজাল্ট বিপর্যয়ে কমিশন গঠন হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্তে কমিশন গঠন হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেগুলির কোনও কিনারা হয়নি। খবরে প্রকাশ, বহু ছাত্র গত বছরের পার্ট-১ পরীক্ষায় যে নম্বর পেয়েছিল, সেই নম্বরই পার্ট-২ পরীক্ষার মার্কসিটে পুনরায় এসেছে এ'বছর। আসলে রেজাল্টের এই অসংগতি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার প্রতিটি ধাপে ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও তার ফল প্রকাশ — সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষাদপ্তরের চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রকাশ ঘটছে বারবার। কারণ সরকারের উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের কাছ থেকে সুকৌশলে শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া।

সমগ্র দেশ জুড়ে তো সেই পরিকল্পনাই চলছে। সেজন্য শাসকগোষ্ঠী, শিক্ষার মতো মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজনকেও পুরোপুরি বেসরকারি মালিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনা করেছে। সেক্ষেত্রে 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল' নীতির রমরমা চলছে শিক্ষাক্ষেত্রেও। মুনাফার বেড়াজালে আবদ্ধ শিক্ষা আজ বিপণিতে সাজানো এক মহার্ঘ পণ্য। একদিকে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমাগত কমানো হচ্ছে, অন্যদিকে সেলফ্ ফিনান্সিং কোর্স ও অন্যান্য গালভরা নাম দিয়ে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে তোলা হচ্ছে। স্কুলে কলেজে ফি বাড়ানো হচ্ছে ব্যাপক হারে। তার ওপর পরীক্ষা গ্রহণ, রেজাল্ট নিয়ে প্রহসন ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার করুণ পরিণতিতে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ড্রপআউটে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। প্রকৃতপক্ষে উদারনীতির প্রবক্তা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার শিক্ষা-স্বাস্থ্যে উদার নয়। উদার তারা মিলিটারি খাতে ব্যয় করতে। (বছরে কেন্দ্র ৭৮ হাজার কোটি টাকা, রাজ্য পুলিশ খাতে ১২০০ কোটি টাকা ব্যয় করছে), সরকার উদার শিল্পপতিদের কোটি কোটি টাকা কর ছাড়ে, তাদের বিদ্যুৎ-জমি-জলের দাম ও মাশুল ছাড় দিতে, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অবাধ অধিকার প্রয়োগে, আর শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে ছাত্রস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণে। পরাধীন ভারতে দেশবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সর্বজনীন শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, লালা লাজপত রাই, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল সকলের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে দেশের মানুষের কাছে আলো-বাতাসের মতো অবাধে শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার আকাঙ্ক্ষা।

স্বাধীনতার পর গত ৬০ বছরে সেই শিক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভর্তি থেকে পরীক্ষা গ্রহণ, ফলপ্রকাশ — আজ চূড়ান্ত প্রহসনে পরিণত।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন এবার কলকাতায়

আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীন দেশে শিক্ষা হবে সর্বজনীন, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক। মানুষ গড়ার, চরিত্র গঠনের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা। স্বাধীনতার পর ছয়টি দশক অতিক্রান্ত, দেশের শিক্ষাচিত্রে তাঁদের মহান স্বপ্ন আজ হারিয়ে গেছে। বিশ্বায়নের হাত ধরে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ হওয়ার ফলে শিক্ষা আজ বাজারের লাভজনক পণ্য। ফি শুধু আকাশছোঁয়াই হয়নি, শিক্ষার মর্মবস্তুকে ধ্বংস করে দেশের শাসকশ্রেণী শিক্ষার লক্ষ্যই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি '৮৬ (এনপিই-৮৬) থেকে শুরু করে বর্তমানে শিক্ষা আজ দেশের শাসকদের হাতে বিনিয়োগের উন্মুক্ত মৃগয়াক্ষেত্র। বিনিয়োগের হাতছানিতে কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় — সর্বস্তরে বাজারের সাথে পাল্লা দেওয়ার প্রতিযোগিতা। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় পর্যন্ত শিক্ষার ফি নির্ধারণে বিনিয়োগকারীর মুনাফা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। এর হাত ধরে বেসরকারি মেডিকেল কোর্সে ফি হয়েছে ৯ লক্ষ টাকা, আর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ৩ লক্ষ টাকা। বাজারের মাপকাঠিতে সাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষার দাম নেই। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এনসিইআরটি তাদের ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কে (এনসিএফ-২০০৫) বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোলের বদলে পঞ্চম শ্রেণী থেকেই কর্মমুখী শিক্ষা চালু করার সুপারিশ করেছে। দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা-সাহিত্য, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ের পঠন-পাঠন এবং মৌলিক গবেষণা। ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য বেসরকারি স্কুল-কলেজ শুধু নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও গজিয়ে উঠেছে।

ভারত সরকার গ্যাটস্ (জিএটিএস) চুক্তিতে সই করার পর থেকে শিক্ষা আজ বিশ্ববাজারের পণ্য। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই)-এর হাত ধরে আসছে অসংখ্য বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়। পয়সা ফেললেই অক্সফোর্ড, কেমব্রিজের ডিগ্রি আপনার পকেটে। বিশ্বজুড়ে শিক্ষাব্যবস্থায় বিনিয়োগ ১লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা হতে চলেছে, যেখানে কেবলমাত্র মার্কিন বিনিয়োগই ৫৯ হাজার কোটি টাকা। ভারতীয় একচেটিয়া মালিকরাও শিক্ষা বেচে লাভের আশায় টাকা ঢালছেন। অন্যদিকে বিপুল খরচের বোঝা টানতে না পেরে ৯৩ শতাংশ ছাত্র ড্রপ-আউট হয়ে শিক্ষার আঙিনার বাইরে চলে যাচ্ছে। গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার চালু করছে 'সর্বশিক্ষা অভিযান', যার মধ্য দিয়ে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষা হবে ধনী আর দরিদ্রের সামর্থ্য অনুসারে দু'রকম। দরিদ্র ঘরের ছাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর বাবা-মা আর নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে ঝাঁপ দেবে অনিশ্চিতের পথে। 'সর্বশিক্ষা' বাস্তবে শিক্ষার সর্বনাশের রূপরেখা। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এর সাথে যুক্ত হয়েছে গ্রেডেশন প্রথা, যা আসলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ারই চক্রান্ত, যে পরিকল্পনার বিষময় ফল আমরা প্রাথমিক স্তরে দেখছি। পরিকাঠামোহীন, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ধুঁকতে থাকা স্কুলগুলিতে এই তথাকথিত 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' স্কুলশিক্ষায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। কলেজস্তরেও পরিকাঠামো গড়ে তোলা দূরে থাক, হাজার হাজার শূন্য শিক্ষকের পদ পূরণ না করে পার্ট টাইমার দিয়ে কাজ চলছে, যার আর্থিক বোঝা টানতে হচ্ছে ছাত্রদেরই।

আরও এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ এসেছে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার মাধ্যমে। এইডস প্রতিরোধের নামে বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউএনইএসসিও, ইউএনআইসিইএফ-এর মতো বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে প্রতিষ্ঠার এজেন্সিগুলির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্কুলস্তর থেকে ছাত্রদের অবাধ যৌনতার পাঠ দেওয়া হচ্ছে। ভাইবোন, বন্ধুত্ব, ভালোবাসার সৌন্দর্যের রস থেকে বঞ্চিত করে ছাত্রদের শেখানো হবে — মানুষ কেবলমাত্র জান্তব প্রবৃত্তির দাস। এইডস্ প্রতিরোধে যে সরকার যৌনশিক্ষার নামে 'সেফ সেক্সের' পক্ষে ওকালতি করছে, সেই সরকারের হাসপাতালে রক্ত পরিবহনের জন্য কোনও নিরাপদ ব্যবস্থা নেই, যা এইডস্ রোগ সংক্রমণের অন্যতম কারণ। টিবি, ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, আন্ত্রিক — যা এদেশে প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে, তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, অর্থাভাবের অজুহাতে। অথচ একদিকে বিপুল অর্থ ব্যয় করে এইডস্ প্রতিরোধের প্রচার চলছে, অন্যদিকে সরকারি মদতে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, সিনেমা, পত্রপত্রিকা, ব্লু-ফিল্মে বাজার ছেয়ে গেছে। সর্বত্র মদ, জুয়া, সাট্টা, ড্রাগের অবাধ আয়োজন। এই পরিস্থিতিতে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা-র আয়োজনে অভিভাবকেরা আতঙ্কিত। ফলে আজ তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার। রাজ্যে- রাজ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের তুমুল প্রতিবাদের সামনে পড়ে বিভিন্ন সরকার বাধ্য হয়েছে 'যৌনশিক্ষা' পঠন-পাঠন বন্ধ করতে। এই রাজ্যেও বহু স্কুলে আন্দোলনের চাপে তারা 'যৌনশিক্ষা' চালু করতে পারেনি।

বাজার সংকটে নিমজ্জিত মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ গ্রাস করছে মানুষের জীবনের সবকিছু। ১৭ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ, কাজ হারানো শ্রমিকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, সরকারের হিসাবেই বেকারের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম, কেন্দ্রের কংগ্রেস বা অন্যত্র বিজেপি ঢাক পেটাচ্ছে উন্নয়ন, শিল্পায়নের। এসইজেড-এর নাম করে ফিরে এসেছে শোষণের মধ্যযুগীয় বর্বরতা। 'উন্নয়নের' জোয়ারে খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে অগণিত কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত পরিবার। আত্মহত্যার মিছিলে দেশ ভরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় নন্দীগ্রামে এসইজেড-এর বিরুদ্ধে কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম মানুষকে নতুন করে সাহস দিয়েছে। কেন্দ্রের মদতে রাজ্যের সিপিএম শাসকরা রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে সাধারণ মানুষের ওপর। অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করেছে ৩ দফায় অন্তত ২৩ জনকে (সরকারি হিসেব), আহত অসংখ্য, চিরতরে নিখোঁজ শতাধিক মানুষ, বহু নারী ধর্ষিতা। তবু আজও মানুষ সিপিএম-এর বশ্যতা স্বীকার না করে লড়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে 'সেজ' বাতিল ঘোষণা করতে।

এই সর্বগ্রাসী সংকটের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্বকে রক্ষা করা আজ সবার কর্তব্য। 'বাম' ভেকধারী এসএফআই, দক্ষিণপন্থী সিপি, টিএমসিপি সকলেই আজ কী শিক্ষাক্ষেত্রে, কী অন্যক্ষেত্রে বিশ্বায়নের এই অবাধ লুণ্ঠনের সমর্থক। একমাত্র সারা ভারত ডিএসও সারা দেশজুড়ে গড়ে তুলেছে এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন, যে আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গে অর্জিত হয়েছে প্রাথমিকে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জয়, তেমনই সূচিত হয়েছে আরও বহু জয়ের সম্ভাবনা। আজ ২২টি রাজ্যে সারা ভারত ডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী, ছাত্রস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সারা ভারত ডিএসও-র উদ্যোগে সপ্তম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন তাই নিয়ে এসেছে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান। আসুন, এই সম্মেলনকে সফল করার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের ছাত্র আন্দোলনকে নতুন ধাপে উন্নীত করার কাজে সকলেই ব্রতী হই।

সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ, ৮ জানুয়ারি, বেলা ১টা

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, কলকাতা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সর্বভারতীয় উপদেষ্টা, এ আই ডি এস ও;
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক, এস ইউ সি আই

বক্তা ঃ কমরেডস দেবাশিস রায়, সাধারণ সম্পাদক অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, সূর্যকর জিতেন্দ্র (বিহার), ঝর্ণা মালব্য (উত্তরপ্রদেশ), প্রশান্ত কুমার (ঝাড়খণ্ড), ভাস্করানন্দ (দিল্লি), রমেশ চন্দ্র (হরিয়ানা), ইন্দর সিং (পাঞ্জাব), রাজু শর্মা (রাজস্থান), সুশীল গোপাল (মধ্যপ্রদেশ), জয়েশ চলিহা (আসাম), বাবুল বণিক (ত্রিপুরা), রমেশ শর্মা (সিকিম), সুরেশ (মণিপুর), শান্তিরাজ (কেরালা), এইচ থিলাগর (তামিলনাড়ু), রাজশেখর (কর্ণাটক), গোবিন্দরাজালু (অন্ধ্রপ্রদেশ), অশোক মিশ্র (ওড়িশা), নভেন্দু পাল (পঃবঙ্গ)।

সভাপতি ঃ কমরেড প্রতাপ সামল, সভাপতি, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ৯-১০ জানুয়ারি, নজরুল মঞ্চ

১০ ডিসেম্বর এ আই ডি এস ও-র ওড়িশা রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাউরকেলায় বিশাল ছাত্রমিছিল (সংবাদ সাতের পাতায়)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in